স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
৫ম বর্ষ ❑ ষষ্ঠ সংখ্যা ❑ আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৬

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
ডা. জয়ন্ত দাস

সহযোগী সম্পাদক
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা. সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ নিত্য দাস, মনোজ দে ,
গোপাল সরকার,
দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু
বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক
গোপাল সরকার
***স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র** তরফে
দাসপাড়া (আংশিক), পূর্ব বুড়িখালি, বাউরিয়া
উলুবেড়িয়া,
হাওড়া ৭১১৩১০

মুখ্য পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৬
ফোন : ২২৫২-৭৮১৬ / ৩৭০৯ / ৯১৬৭

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

নেশা

জেনেশুনে বিষ পান করার লোকের অভাব নেই, কিন্তু শেষমেষ তাঁরাই আবার প্রাণের আশাও ছাড়েন না। নেশা-ধরা সহজ, ছাড়া শক্ত। কে নেশা করে, কেন করে, কী করে নেশা শুরু হয়, নেশার ডাক্তারি দিক থেকে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দিক—এ সব নিয়েই আলোচনা করেছেন **ডা. সুমিত দাশ**।

৪

গ্যাসের ব্যথার রহস্য

বাংলায় পেটের গ্যাসের বড়ো আধিক্য। এখানে মাথা ধরে গ্যাস থেকে, বুক-ধড়ফড় গ্যাসের প্রকোপে, নির্ঘুম রাত আর কোমরের বাত—সবই গ্যাসের অবদান। কিন্তু বিজ্ঞানীরা যে পেটের গ্যাসের অমন বিচিত্র পথে চলাফেরা করার রাস্তাই খুঁজে পাননি! তাহলে? তাহলে কী, লিখেছেন **ডা. গৌতম মিস্ত্রী**।

৮

গ্লকোমা

আমাদের চোখের ভেতরে একটা স্বচ্ছ জলীয় পদার্থ থাকে, সেটা সবসময় নতুন করে তৈরি হয়, আর চোখ থেকে বেরিয়েও যায়। কোনো কারণে সে জিনিস বেশি পরিমাণে চোখে জমার প্রবণতা হলে শুরু হয় গ্লকোমা। প্রথম থেকে সতর্ক হয়ে ডাক্তারের কাছে গেলে বিপদের সম্ভাবনা কমই, কিন্তু রোগীরা সেই প্রথম লক্ষণ বুঝতে পারেন না। সে সব বুঝিয়ে দিয়েছেন **ডা. সোহম সরকার**।

২১

শিশুর একজিমা ও তিনটি সংলাপ

একজিমা সারালে কি হাঁপানি হয়? বাচ্চাদের একজিমা কি সারে? কতটা ভয়াবহ এই রোগ, আর কতটাই বা সহজপ্রাপ্য? মনের কোণে জমে থাকা প্রশ্নগুলো অভিভাবকরা যেমন করে বলতে পারলে খুশি হন, তেমন করেই খুঁজে বের করে উত্তর দিয়েছেন **ডা. জয়ন্ত দাস**।

৪১

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত লেখা জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। এইসব লেখা পড়ে কেউ নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করবেন না, করলে সেই চিকিৎসার ফলে যে অসুবিধা বা বিপদ ঘটতে পারে, তার দায় সম্পূর্ণভাবেই সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* সেজন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়		৩
নেশা	ডা. সুমিত দাশ	৪
গ্যাসের ব্যথার রহস্য	ডা. গৌতম মিস্ত্রী	৮
মলদ্বার দিয়ে রক্তপাত	সম্পাদকীয় দল	১৪
রিপোর্ট		
উত্তরবঙ্গে চা বাগানে মেডিক্যাল ক্যাম্প	ডা. পুণ্যব্রত গুণ	১৬
আর্সেনিক অথবা মৃত্যুর ছিন্ন দিনলিপি	দিলীপ ব্যানার্জী	১৭
তিনি বৃদ্ধ হলেন ...	রুমঝুম ভট্টাচার্য	১৯
গ্লকোমা সম্বন্ধে দু-একটা কথা যা আমি জানি	ডা. সোহম সরকার	২১
রিপোর্ট		
নিষিদ্ধ কাশির ওষুধ	ডা. পুণ্যব্রত গুণ	২৩
ওষুধ কিনতে গিয়ে এক ভয়ংকর সত্যের মুখোমুখি	সৌম্য সেনগুপ্ত	২৫
অ্যালোপ্যাথি ওষুধ ও তার সাইড এফেক্ট	ডা. অর্ক বৈরাগ্য	২৭
কুসুমবাই ও সন্দীপ্তাকে মনে রেখে	মেয়েদের স্বাস্থ্য ভুবন	২৯
বন্ধ্যাত্বের একমাত্র এবং অব্যর্থ চিকিৎসা কি আইভিএফ?	ডা. কাঞ্চন মুখার্জি	৩০
ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে	প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়	৩৪
স্কিন গ্রাফটিং	ডা. সৌম্যকান্তি বাগ	৩৮
শিশুর একজিমা ও তিনটি সংলাপ	ডা. জয়ন্ত দাস	৪১
পোশাকের বিবর্তন 'পণ্য' ও ফাংগাস	ডা. শর্মিষ্ঠা দাস	৪৭
বই পড়া		
সাপ নিয়ে ভুল ভাঙা সাপের কামড় খেয়ে বেঁচে থাকা	অলকেশ মণ্ডল	৫০
হরেক রকম		
ফাইজার কোম্পানিকে নিউমোনিয়া টিকার পেটেন্ট দেবার বিরোধিতায় 'ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস'		৫৩
মায়ের দুধের পরেও কোনো 'ফর্মুলা দুধ' নয়		৫৫
শব্দছক প্রস্তুতি	রুচিরা মজুমদার	৫৬

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান

কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল

পাতিরাম
বুকমার্ক
পিপলস বুক সোসাইটি
বই-চিত্র
মনীষা গ্রন্থালয়
নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট

কলকাতার অন্যত্র

অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ)
এস কে বুকস (উল্টোডাঙা)
লেখনী, ২/৪৬ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭,
কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়)
বইকল্প (ঢাকুরিয়া)
দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি (উত্তর কলকাতা)
জ্ঞানের আলো (যাদবপুর, কলকাতা-৩২)

কলকাতার বাইরে

শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল)
ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ)
পুষ্প নিউজ এজেন্সি (মালদহ, ফোন ৯৯৩২৯৬৭৯৯১)
জাতিস্মর ভারতী (জলপাইগুড়ি, ফোন ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮)
প্রয়াস মল্লভূম (লোকপুর, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৩৪২২৭৪৯৯)
মাধব পেপার স্টল, (বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড, ফোন ৯৯৩২৪৫৫২৪৪)
প্রদীপন গাঙ্গুলি (দার্জিলিং, ফোন ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২)
আনন্দম (মাথাভাঙা, বরুণ সাহা, ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮, ৯৭৩৩১১৬৪৪২
সোমা দত্ত (হাওড়া, ফোন ৯১৪৩২৪৫৯৩৭)
যুক্তিবাদী সমিতি (বাগনান, ফোন ৯৮৩০৬০৩০২৯)

শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের বই-এর স্টলে।

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭

পত্রিকা পাওয়ার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৮৮৬৪৪১, ৯৪৭৭০২৮১৫৭

ইমেল: swasthyerbritte@gmail.com

***'স্বাস্থ্যের বৃত্তে'*-র গ্রাহক হোন।**

সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬টি সংখ্যার জন্য ১৮০ টাকা।

Swasthyer Britto-র নামে চেক বা ড্রাফট পাঠান এই ঠিকানায়-
এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা ৭০০ ০৯৭

আউটস্টেশন চেকে ৩০ টাকা আরও যোগ করুন

অথবা

NEFT-র মাধ্যমে টাকা পাঠান এই অ্যাকাউন্টে

Swasthyer Britto
A/c No.0315101025024
Canara Bank, Princep Street Branch
IFSC Code: CNRB0000315

সম্পাদকীয়

নেশা, অর্থমনর্থম, রাজনীতি

অবশেষে গত ১৬ জুন মুক্তি পেল 'উড়তা পঞ্জাব'। উড়ন্ত পাঞ্জাব। কীসে ওড়ে পাঞ্জাব? নেশায়, ড্রাগে, হেরোইনে, ধোঁয়ায়, ইন্ট্রাভেনাস নানা ককটেলে। ৪ জুন সেন্সর বোর্ড বলেছিল, বদলাতে হবে ৮৯টা দৃশ্য। বড়ো ব্যানারের প্রোডাকশন হাউস, অতএব টক্কর সেয়ানে সেয়ানে, কেস গেল মুম্বাই হাইকোর্টে, আর দ্রুত রায় ১৩ জুন—একটা মাত্র 'কাট'-ই যথেষ্ট! ইতিমধ্যেই বিশাল ব্যাবসা পেয়েছে উড়তা পঞ্জাব, তৈরির খরচের দ্বিগুণ টাকা উঠে গেছে। মাল্টিপ্লেক্সে পপর্কন খেতে খেতে মানুষ তারিয়ে তারিয়ে দেখছেন টমি সিং (শাহিদ কাপুর)-এর নাচ আর গান, তার কোকেন নেওয়া, গান-নাচের মধ্যে দিয়ে নেশার মস্তি-কে গ্লোরিফাই করা। তারপর একদিন টমিরই নাচাগানায় মজে নেশার মৃত্যুপুরীতে ঢুকে পড়া কিছু তরুণকে মুখোমুখি দেখে টমি, তারা টমিকে আইকন-পূজো করে, আর মেইনস্ট্রিম হিন্দি মুভির শর্ত মেনে টমি ড্রাগের সঙ্গে ব্যক্তিগত লড়াইতে নেমে পড়ে।

টমির গল্প, নেশা-ছাড়ানোর ক্লিনিক চালানো ডাক্তারের গল্প, ড্রাগচক্রে আটকা পড়া এক হকি-খেলা-মেয়ের গল্প, নেশা করে শেষ-হওয়া যুবকের গল্প। নরকের গল্প, আর নরকের কাপ্তান কিছু রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে পুলিশের লেনদেনের গল্প। এক ঘুষ-খাওয়া-পুলিশের বিবেক জাগ্রত হয়ে যথা—ডোজ মারামারি-বন্দুকবাজির পর ড্রাগচক্র-ভেদের ইচ্ছাপূরণের গল্প—যদিও বড়ো-নেতা পর্যন্ত ন্যায়ের হাত পৌঁছোয় না।

হঠাৎ এখানে সিনেমা-আলোচনা দেখে পাঠক ঘাবড়ে গেছেন হয়তো। ড্রাগের নেশার ডাক্তারি দিকগুলো নিয়ে এবারের এক প্রধান প্রচ্ছদ নিবন্ধ। কিন্তু এই কথাটা সেই প্রবন্ধে বুড়িছোঁওয়া করে হলেও বলতে হচ্ছে, ড্রাগচালান এখন আন্তর্জাতিক প্রধান ব্যাবসাগুলোর অন্যতম। সেটা সম্ভব হয় তখনই যখন বড়োমাপের দেশনেতারা ড্রাগের ব্যাবসাকে চলতে দেন। দেশটা গণতান্ত্রিক ভারত হোক আর হোক যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান, বা হোক লাতিন আমেরিকার কলম্বিয়া, হেরোইন-কোকেন আর নানা ককটেল ড্রাগের ব্যাবসার লাভের গুড় দেশনেতাদের কারও ঘরে না পৌঁছোলে ড্রাগ ব্যাবসা চলতে পারত না, আর পুলিশ-বিএসএফ-মিলিটারিকে না জড়িয়ে আন্তর্জাতিক ড্রাগ পাচার চলে না। এ কথাটা না বুঝলে নেশাবিরোধী আন্দোলন, তা যেখানে যতটুকুই গড়ে উঠুক না কেন, শেষ বিচারে একচক্ষু হরিণই থেকে যাবে।

'নেশা কতটা ভয়ানক জিনিস? নেশা বলতে বলছি সেই নির্দিষ্ট 'অসুখ'-টির কথা যাতে নেশার দ্রব্যের ওপর মানুষটি মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, কাজের জায়গায়, পরিবারে ও সমাজে ক্ষতি হচ্ছে জেনেও ছাড়তে পারে না, ক্রমশ মাত্রা বাড়াতে থাকে আর প্রায়শই বড়ো রকমের শারীরিক সমস্যা, এমনকী মৃত্যুকে ডেকে আনে। নেশা করলে অবাঞ্ছিত আচরণ করে, আবার নেশা ছাড়তে গেলে সমস্যায় পড়ে। ভারতবর্ষে পারিবারিক হিংসার এক বড়ো কারণ হল নেশা, বিশেষ করে মদ (অ্যালকোহল)। অনেকেই মদকে তেমন ক্ষতিকর মনে করেন না, এমনকী ডাক্তারিশাস্ত্রেও অল্প মদ্যপানের কিছু শারীরিক সুফলের কথাও বলা হচ্ছে। সমস্যা হল, নিয়ন্ত্রণ হারানোর সম্ভাবনা খুব বেশি। মনে রাখতে হবে, কর্মক্ষম জীবনের দিন কমিয়ে দেয় যে সব নেশা, তাদের তালিকায় মদের নেশা সপ্তম স্থানে। মানে পৃথিবীতে আর মাত্র ছ-টা রোগ মানুষকে এমন অসুস্থ অকেজো করতে পারে।

তাতে কার কী যায় আসে? হাজার হোক, বিশ্বে নেশার দ্রব্যের ব্যাবসা হল ফি-বছর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার, আন্তর্জাতিক বর্ডার পেরিয়ে বেআইনি নেশাদ্রব্য চালানের ব্যাবসার যতটুকু আন্তর্জাতিক নজরদারি সংস্থার গোচরে এসেছে সেটাই কম করে বছরে ৩২ বিলিয়ন ডলার; আর কে না জানে নজরে-না-আসা ব্যাবসাটা অনেক বড়ো। অবশ্য নেশা ছাড়ানোর চিকিৎসার 'ব্যাবসা'-র হিসেব আমেরিকায় বেশ নিখুঁত, যদিও গোটা পৃথিবীর কথা জানা যায় না—কেবল আমেরিকায় এই চিকিৎসা-'ব্যাবসা'-র পরিমাণ বছরে ৩৫ বিলিয়ন ডলার, যদি *ফোর্বস পত্রিকা*-র হিসেবকে বিশ্বাস করতে হয়!

বাড়িতে কোনো নেশাড়ু থাকার দুর্ভাগ্য আপনার না থাকলেও, পাড়াতে নেশাড়ু 'সমাজবিরোধী'-রা উৎপাত না করলেও, আপনি এই বিশাল অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যের বাইরে থাকতে পারবেন না। এ হল বর্তমান দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার এক বড়ো স্তম্ভ। এর মূলে কুঠারাঘাত করলে কোথাকার ধোঁয়া কোথায় উঠবে বলা ভার।

নেশা

ডা. সুমিত দাশ

সে অনেকদিন আগের কথা। ত্রিশ বছর তো হবেই। তখনও যৌথ পরিবার সগৌরবে টিকে আছে। এরকমই এক পরিবারে এক বছর ছয়ের বাচ্চা মেয়ে তার ছোটো কাকার খুব নেওটা। রাতে শোওয়ার সময় ছাড়া সে কাকার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। হামাগুড়ি দেওয়ার সময় থেকেই—স্কুলে যাওয়ার চল তখনও শুরু হয়নি, তাই তার হেসেখেলে সময় কাটে ছোটো কাকার সঙ্গে। সমস্যা হল ছ-বছর বয়সে হাতেখড়ি দিয়ে স্কুলে পাঠানোর চেষ্টা হতেই। বেলা দশটায় স্কুল। সে কিছুতেই যাবে না কাকাকে ছেড়ে। বুঝিয়ে, বকে এমনকী দু-ঘা লাগিয়েও তাকে কিছুতেই স্কুলে পাঠানো যায় না, কাকার প্রতি বাচ্চাটির এই টান সকলের অস্বাভাবিক লাগতে শুরু করল। নানা লোকে নানা কথা বলে। জ্যোতিষী থেকে পারিবারিক ডাক্তার। সবাই অথৈ জলে। শেষে পারিবারিক ডাক্তারের পরামর্শেই সে যুগের হাওড়া তথা পশ্চিমবঙ্গের এক প্রবাদপ্রতিম ডাক্তারের কাছে বাচ্চাটাকে নিয়ে যাওয়া হল। মা, বাবা আর কাকার গা ঘেঁষে থাকা বাচ্চা মেয়েটি চেম্বারে ঢুকল। শোনা যায় সব কথা শুনে সেই ডাক্তারবাবু নাকি নাটকীয়ভাবে কাকার গালে সপাটে এক চড় লাগায়। সবাই হতবাক। তারপর তিনি বলেন যে ওই অবিবাহিত বেকার যুবকটি বেলা দশটার সময় ঘরের দরজা বন্ধ করে হেরোইনের নেশা করে। আর বাচ্চাটিও সঙ্গে থেকে থেকে এমন আসক্ত হয়ে গেছে যে ওই সময় কাকাকে ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারে না। সেই সময় এই ডাক্তারবাবু সম্পর্কে অনেক 'মিথ' চালু ছিল। সম্ভবত এটাও একটা মিথ। কিন্তু গল্পটিতে নেশার মূল বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ নেশার বস্তুর ওপর তীব্র নির্ভরতা ভালোভাবে ফুটে উঠেছে।

নেশার ভাষা ও পরিভাষা

পাতাখোর (হেরোইন নেয় যারা), গাঁজাখোর, মদখোর এত সব বিশেষণ চালু আছে। এগুলো চালু হয়েছে কে কী নেশা করে তার ওপর নির্ভর করে। তবে সব মিলিয়ে নেশা বলতে সবাই একবাক্যে একটা কথা বলে—অ্যাডিকশান (Addiction)। মোটামুটি বোঝানো হয় কোনো একটা 'বস্তুর' মানে নেশার জিনিসের প্রতি তীব্র আসক্তির কথা। কিন্তু অ্যাডিকশান কথাটির ব্যাপ্তি বেশি—টিভি দেখা, টাকা রোজগার বা জুয়ো খেলা এবং আরও অনেক কিছুর প্রতি তীব্র আসক্তি—সেখানে সাধারণভাবে অ্যাডিকশান কথাটা ব্যবহার করা হয়। তাই নেশার সমস্যাকে আলাদা করার জন্যে ডিপেন্ডেন্স (dependence) বা নির্ভরতা কথাটা ব্যবহার করা হয়। এই নির্ভরতা ফিজিক্যাল (Physical) বা শারীরিক নির্ভরতা হতে পারে। এটা বলতে বোঝায় নেশার দ্রব্য পাওয়ার জন্যে যে সব আচরণ সে করে। আর আছে সাইকোলজিক্যাল ডিপেনডেন্স (Pshychological Dependence) বা মানসিক নির্ভরতা। এটা বলতে বোঝায় নেশার বস্তু ব্যবহার করাকে অভ্যাসে পরিণত করা এবং যাতে এই মৌতাত থেকে বঞ্চিত না হয় সে জন্যে নেশার প্রতি তীব্র আসক্তি। এই তিন ধরনের নির্ভরতাই হচ্ছে নেশা করার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এছাড়া আর কয়েকটি কথা আমাদের জানতে হবে। ইনটক্সিকেশান (Intoxication) বা আচ্ছন্নতা। এর মানে হচ্ছে নেশার দ্রব্যের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার জন্যে নেশাড়ুর মানসক্রিয়ার যে সমস্ত পরিবর্তন হয় যেমন— মেজাজ, বুদ্ধিবৃত্তি, সচেতনতা, বিচারক্ষমতার পরিবর্তন। উইথড্রয়াল (Withdrawal) বা অপসারণ। অর্থাৎ দীর্ঘদিন নেশা করার পরে হঠাৎ নেশা করা বন্ধ করে দিলে শরীর-মনে যে উপসর্গগুলো দেখা যায়। টলারেন্স (Toldrance) বা সহনমাত্রা। কোনো একটি দ্রব্য একই মাত্রার ব্যবহার করতে করতে আগের মতো 'মৌতাত' হয় না অর্থাৎ শরীর সয়ে নিয়েছে। তাই সেই একই মৌতাত পেতে তাকে নেশায় মাত্রা বাড়াতে হয়। এই ক-টি কথা জেনে নিয়ে এবার পরের আলোচনায় যাওয়া যাক।

মানুষ নেশা করে কেন?

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর *শেষ প্রশ্ন* উপন্যাসে এরকম একটা কথা বলেছিলেন—মদ খেয়ে যে বলে মাতাল হইনি, হয় সে মিথ্যে কথা বলে অথবা মদের বদলে বোতলে করে জল খায়। মোদ্দা কথা নেশা করার জন্যেই লোকে নেশা করে। তারপর তো গঙ্গা, মিসিসিপি, টেমস দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। তাই নেশা করার পেছনেও অনেক কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে।

সব মানুষই কোনো একটা মাত্র কারণে নেশা করে এরকম নয়। অনেকগুলি বিষয় এর সঙ্গে জড়িত থাকে। আর পাঁচটা রোগের মতো নেশাতেও জিন-এর ভূমিকা খুঁজে পাওয়া গেছে। পূর্ববর্তী প্রজন্মে নেশার সমস্যা থাকলে পরের প্রজন্মে নেশার সমস্যা আসার সম্ভাবনা বেশি। এছাড়া মস্তিষ্কে একটা স্নায়ুজাল আছে যাকে বলা হয় ব্রেন রিওয়ার্ডিং সার্কিট

(Brain Rewarding Circuit)। এখানে মূল যে রাসায়নিক যৌগটি সংযোগকারী ভূমিকা পালন করে তাকে বলে ডোপামিন। বলা হয় মানুষ নেশা করলে এই সার্কিটের মাধ্যমেই তার 'মৌতাত' হয়। তাই সে বারবার নেশা করে।

কিন্তু শুধু 'জিন' আর 'সার্কিট' থাকলেই তো মানুষ নেশাড়ু হয় না! আর এখানেই আসে পরিবেশের ভূমিকা। এমনিতে শিল্পায়ন, নগরায়ণ এবং কর্মসূত্রে মানুষের পরিযায়ী জীবনের জন্যে পূর্বের পারিবারিক বন্ধন অনেকটাই আলগা হয়ে গেছে। তাই নেশার বিরোধিতা করার মতো আর পাঁচজন মানুষ সবসময় কাছে থাকে না। আর নেশার সুবিধা ক্রমে বাড়ছে—পয়সা ফেললেই যেকোনো জায়গায় যেকোনো নেশার বস্তু প্রাপ্তির সুবিধা। তাই নেশা শুরু হওয়া খুব সোজা। প্রথমদিকে কাজ করে কৌতূহল এবং বন্ধুবান্ধবদের চাপ। নেশা করে অন্যান্য বন্ধুদের কাছে সমীহ

শিল্পায়ন, নগরায়ণ এবং কর্মসূত্রে মানুষের পরিযায়ী জীবনের জন্যে পূর্বের পারিবারিক বন্ধন অনেকটাই আলগা হয়ে গেছে। তাই নেশার বিরোধিতা করার মতো আর পাঁচজন মানুষ সবসময় কাছে থাকে না।

আদায় করেও নেওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে কাজ করে মানুষের জৈবিক গঠন এবং ব্যক্তিত্ব। যেটা জিন-প্রভাবিত। বর্তমানে নেশাকে একটি মস্তিষ্কের বিকলতা বা ব্রেন ডিসঅর্ডার (brain disorder) ভাবা হচ্ছে। কারণ হিসেবে বলা হয়, নেশা করতে করতে মানুষের মস্তিষ্কের গঠন ও কার্যকারিতার বেশ কিছু পরিবর্তন আসে যেটা তাকে পরবর্তীকালে নেশা করতে বাধ্য করে। অনেকেই এই মতের বিরোধী। তাঁরা বলেন নেশাড়ুকে ইতিবাচক রাস্তা দেখিয়ে নেশার পথ থেকে সরিয়ে আনা যায়—যেটা ব্রেন ডিসঅর্ডার হলে সম্ভব হত না।

কখন বলা হবে নেশা করেছে?

একটা নেশার দ্রব্য অস্বাভাবিক মাত্রায় ব্যবহার করার জন্যে মানুষের মধ্যে কিছু নতুন কিন্তু অবাঞ্ছিত আচরণ ফুটে ওঠে। সেগুলোর ওপরে ভিত্তি করেই নির্ধারণ করা হয় সে নেশা করছে কিনা। সবার মধ্যে সব ক-টি উপসর্গ নাও থাকতে পারে। তবে একটানা ১২ মাস সময় ধরে অন্তত দুটো উপসর্গ থাকতে হবে, তবে বলা যাবে সে 'নেশা'য় পড়েছে।

১. বারবার নেশা করার জন্যে নিজের দায়িত্ব কর্তব্য অবহেলা করা। যেমন একজন ছাত্রের পড়াশুনো ঠিকমতো না করা, স্কুল বা কলেজে না যাওয়া অথবা একজন অফিসকর্মীর ঠিকমতো অফিস না যাওয়া।

২. নেশা এমন জায়গায় করা যেখানে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যেমন গাড়ি চালাতে চালাতে বা কারখানায় মেশিন চালাতে চালাতে।

৩. সামাজিক অথবা পারিবারিক সম্পর্ক খারাপ হওয়া সত্ত্বেও নেশা চালিয়ে যাওয়া। যেমন নেশার প্রভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া এমনকী মারামারি পর্যন্ত হওয়া।

৪. টলারেন্স (Tolerance) বা সহনমাত্রায় পৌঁছে যাওয়ার ফলে নেশার পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া।

৫. উইথড্রয়াল (withdrawal) বা অপসারণ—সাময়িক নেশা বন্ধ করায় শরীর মনে নানা উপসর্গ দেখা দেয়।

৬. নেশার বস্তু যতটা গ্রহণ করবে স্থির করেছিল, তার থেকে বেশি পরিমাণ বেশি সময় ধরে নেওয়া।

৭. নেশার বস্তু কম ব্যবহার করার বার বার ব্যর্থ প্রয়াস করা।

৮. দিনের একটা বড়ো সময় কাটে নেশার বস্তু পাওয়ার চেষ্টায়। কোথায় কীভাবে নেশা করবে সেই পরিকল্পনায়।

৯. নেশার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক এবং পেশাগত কাজ কমিয়ে দেওয়া। এছাড়া অন্যান্য বিনোদন বর্জন করা।

১০. সে জানে যে নেশা করলে কী কী ক্ষতি হতে পারে তবু নেশা চালিয়ে যায়।

১১. কোনো একটা বিশেষ নেশার বস্তু পাওয়ার জন্যে তীব্র ইচ্ছা থাকা।

একজন মানুষকে নেশাড়ু বলা যায় কিনা তার একটা উপায় বলা হল। এবার দেখা যাক নেশা করলে কী কী স্বাস্থ্য-সমস্যা হতে পারে।

নেশায় স্বাস্থ্যহানি

১. নেশার জন্যে অনেক মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। উদ্বেগ, অবসাদ ইত্যাদি। তা ছাড়া বাড়ে অপরাধপ্রবণতা, ভারতবর্ষে গৃহ-হিংসার (Domestic Violence) একটা মূল কারণ হচ্ছে নেশা। নেশার পয়সা পাওয়ার জন্যে অথবা নেশার প্রভাবে বাড়ির লোকের ওপর নেশাড়ু হামলা চালায়।

২. ইঞ্জেকশানে কিছু নেশার দ্রব্য নেওয়ার জন্যে বাড়ে HIV এবং হেপাটাইটিস বি হওয়ার সম্ভাবনা।

ইঞ্জেকশানে কিছু নেশার দ্রব্য নেওয়ার জন্যে বাড়ে HIV এবং হেপাটাইটিস বি হওয়ার সম্ভাবনা।

৩. নেশা করার জন্যে পুষ্টির দিকটা অবহেলিত হয়, তাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এর ফলে নেশাড়ুদের নানা রকম রোগ হতে পারে।

৪. ফ্যাটি লিভার, সিরোসিস, গ্যাস্ট্রিক আলসার, প্যাংক্রিয়াটাইটিস, ভিটামিনের অভাব—মূলত মদ খাওয়ার জন্যে হয়।

৫. হেরোইন এবং অন্যান্য ওই জাতীয় ওপিঅয়েডে (পপি গাছের ফল ওপিয়াম বা আফিমের অ্যালক্যালয়েড) অনেক সময় অ্যালার্জি হয়। তাতে করে বুকে জল জমে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

৬. অনেক সময় মাত্রা ছাড়িয়ে বেশি নেশা করার ফলে 'ওভারডোজ' হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

৭. নেশাড়ুদের মধ্যে উদ্বেগ, অবসাদ বেশি থাকে। আর থাকে কিছু ব্যক্তিত্বের সমস্যা। নেশার কারণে পরিবার ও সমাজ বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়।

তাই সাধারণ মানুষের তুলনায় নেশাড়ুদের আত্মহত্যার সম্ভাবনা ২০ গুণ বেশি। মদাসক্তদের মধ্যে শতকরা ১৫ জন আত্মহত্যা করে। এখানে বলে রাখি ভারতবর্ষে প্রতিদিন গড়ে ৭ জন নেশাড়ু আত্মহত্যা করে।

বর্তমান প্রবন্ধে বিভিন্ন মাদক দ্রব্যে নেশার কথা অনেকটা একসঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে বলা হয়েছে, সবচেয়ে পরিচিত মাদক, মদ অর্থাৎ অ্যালকোহল, নিয়ে আলাদাভাবে তেমন বলা হয়নি। মদ্যপানের সুফল নিয়েও আজকাল চিকিৎসাবিজ্ঞানী-মহল অনেক গবেষণা করছেন, সেগুলোকে অগ্রাহ্য করবার কারণ নেই। আমাদের সমাজে মদ খাওয়ার গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশ বাড়ছে। মদ্যপান-বিরোধীদের 'শুচিবেয়ে পিসিমা'-র আখ্যায় অভিহিত করাটা চালু নাগরিক ফ্যাশন হয়ে উঠছে। অল্পস্বল্প মদ খাওয়া হয়তো তেমন খারাপ নয়, কিন্তু 'মদের নেশা' তো অল্পে সন্তুষ্ট থাকার জিনিস নয়। নেশাড়ুর কাছে মদ ক্ষতিকর, এবং তা আরও বেশি ক্ষতিকর এইজন্য যে মদ বহুলপ্রচলিত।

একটি পরিসংখ্যানের উল্লেখ করলেই বোধহয় মদের নেশার ক্ষতির দিকটা পরিষ্কার হয়। যেকোনো রোগ কতটা ভয়াবহ, সেটা মাপার অনেকরকম বিজ্ঞানসম্মত উপায় আছে। সেরকম একটা উপায় বা 'স্কেল' হল 'ডিজিস অ্যাডজাস্টেড লাইফ ইয়ারস' (Disease Adjusted Life Years), সংক্ষেপে 'ডালি' (DALY)। রোগভোগ ব্যতীত একজন মানুষ কতদিন সুস্থভাবে বেঁচে থাকল, 'ডালি' দিয়ে সেটাই মাপা হয়। কোনো রোগ পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সম্মিলিত 'ডালি' যত বেশি কমায়, সেই রোগ তত বেশি ক্ষতিকর।

মদ (অ্যালকোহল)-এর নেশা 'ডালি' কমানোর তালিকায় একেবারে ওপরের দিকে গত বছর এর স্থান ছিল সপ্তম। অর্থাৎ পৃথিবীতে মাত্র আর ছ-টা রোগ মানুষের রোগমুক্ত জীবনের দৈর্ঘ্য মদের নেশার চাইতে বেশি কমায়।

নীতিশকুমার বোধহয় খুব ভুল করেননি!

মানুষ কী কী নেশা করে

যুক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা জ্যোতিষ বিরোধী পুস্তক লেখার সময় প্রথমে বলে নেন জ্যোতিষ শাস্ত্রটি কী। তারপর যুক্তি দিয়ে সেই

মদ (অ্যালকোহল)-এর নেশা 'ডালি' কমানোর তালিকায় একেবারে ওপরের দিকে গত বছর এর স্থান ছিল সপ্তম।

কুযুক্তিগুলোকে খণ্ডন করেন। কিন্তু অনেক মানুষ প্রথম অংশটি পড়ে ঘরোয়া জ্যোতিষী হয়ে পড়েন। তাই নেশার দ্রব্য নিয়ে বেশি চলতে গেলে ভয় হয় এটা পড়ে কৌতূহলী মন না নতুন নেশার খপ্পরে পড়ে যায়।

যাইহোক যে নেশাগুলো বেশি করা হয় সেগুলো হল— ১. মদ; ২. গাঁজা, চরস, ভাঙ, সাহেবদের M.J. (Mary Jane) সবই ক্যানাবিস গাছ থেকে তৈরি হয়; ৩. ক্যাফিন কফি গাছ সহ ৬০টিরও বেশি গাছে পাওয়া যায়; ৪. LSD, ফেনসাইক্লিডিন জাতীর অলীক অনুভূতিকারী এবং বাস্তব বিচ্ছিন্নতাকারী দ্রব্য; ৫. উদ্বায়ী বস্তু যেটা শ্বাসের সঙ্গে নেওয়া হয়। এখন বিশেষত বাচ্চাদের মধ্যে ডেনড্রাইট (আঠা) খুব চলছে। এছাড়া রং, গ্যাসোলিন, প্রপেন এর মধ্যে পড়ে; ৬. ওপিঅয়েড—পপি গাছের ফল থেকে ২০টি অ্যালকেলয়েড। আগেকার আফিং এর মধ্যে পরে। এছাড়া

অনেক সিন্থেটিক ওপিঅয়েড এর মধ্যে পড়ে। হেরোইন, ব্রাউন সুগার, মিথাডন, কাফ সিরাপে থাকা কোডিন; ৭. উদ্বেগনাশক ও ঘুমের ওষুধ-এর মধ্যে অ্যালপ্রাজোলাম এবং নাইট্রাজিপাম প্রধান নেশার ওষুধ; ৮. উত্তেজক দ্রব্য—অ্যাম্ফিটিন ও এফিড্রিন এবং সিউডোএফিড্রিন। কোকেন কোকা গাছের পাতা থেকে তৈরি হয়; ৯. তামাক জাতীয় জিনিস—বিড়ি, সিগারেট, জর্দা; ১০. স্টেরয়েড—ন্যানড্রোলোন, অক্স্যানড্রোলোন ইত্যাদি।

প্রত্যেকটা মাদকদ্রব্য নিলে তার জন্যে কখনো-না-কখনো ইনটক্সিকেশান (intoxication) বা আচ্ছন্নতা এবং উইথড্রয়াল (withdrawal) বা অপসারণের প্রভাব দেখা যায়।

প্রত্যেকটা মাদকদ্রব্য নিলে তার জন্যে কখনো-না-কখনো ইনটক্সিকেশান (intoxication) বা আচ্ছন্নতা এবং উইথড্রয়াল (withdrawal) বা অপসারণের প্রভাব দেখা যায়। প্রত্যেকটার বিস্তারিত বিবরণে যাব না, বহুল ব্যবহৃত মদ, গাঁজা এবং হেরোইন নিয়ে খানিকটা আলোচনা করব।

ইনটক্সিকেসন (Intoxication) বা আচ্ছন্নতা

মদ: কথা জড়িয়ে যাওয়া, টলমল করা, কান ভোঁ ভোঁ করা, চোখে দুটো দেখা, স্মৃতির ও মনোযোগের সমস্যা এবং অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞান হয়ে যায়।
গাঁজা: বাইরের যেকোনো উদ্দীপনায় অতিরিক্ত সাড়া দেয়, বেশি উজ্জ্বল দেখা, সময় যেন ধীরে চলে, হাত পায়ের পেশিক্রিয়া অসংলগ্ন হয়, দেহ-বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেকে দেখা বা বাস্তবকে অন্যভাবে দেখা।
হেরোইন: মনমেজাজ বিরক্ত থাকে, কথা জড়িয়ে যায়, মনোযোগ কমে যায়, পেশিক্রিয়া ধীর হয়ে যায়।

উইথড্রয়াল (Withdrawal) বা অপসারণ

মদ: সারা দেহে কাঁপুনি, বুক ধড়ফড় করা (মদ ছাড়ার ৬-১৮ ঘণ্টার মধ্যে)। ভ্রান্তি বা ডেলিউশান (Delusion) যেমন—লোককে সন্দেহ করা। অলীক

অনুভূতি বা হ্যালুসিনেশান (hallucination) —মনে হয় কেউ ''যেন কানে কানে'' কথা বলছে, বা চোখে নানারকম দেখা যেগুলো আদতে নেই। সাধারণত মদ ছাড়ার ৮-১২ ঘণ্টার মধ্যে এইসব উপসর্গগুলো দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে মৃগীর মতো খিঁচুনি হয়। আর একটি ভয়ংকর উপসর্গ দেখা দিতে পারে, যাকে বলা হয় ডেলিরিয়াম ট্রিমেন্স (delerium tremens)। এই অবস্থায় মানুষটির আচরণ আন্দাজ করা যায় না। সে অন্যকে আক্রমণ করতে পারে বা আত্মহত্যার চেষ্টা করতে পারে। বাস্তব সম্পর্কে সচেতনতা লোপ পায়। চিৎকার চেঁচামেচি করে। সাধারণত মদ ছাড়ার এক সপ্তার মধ্যে হয়। ফুসফুস, কিডনির সংক্রমণ বা হার্ট ফেলিয়োর দিয়ে এটা শুরু হতে পারে।

গাঁজা: বিরক্তিভাব, ঘুম খিদে কমে যাওয়া, উদ্বেগ বেড়ে যাওয়া, স্বপ্ন দেখা, গাঁজা খাওয়ার তীব্র ইচ্ছা হয়। সাধারণত গাঁজা ছাড়ার দু-সপ্তাহর মধ্যে হয়।

হেরোইন: বিরক্তি, খিটখিটে মেজাজ, পেশিতে যন্ত্রণা, নাক, চোখ দিয়ে জল পড়ে। লোম খাড়া হয়ে যায়, বার বার হাই ওঠে। চোখের তারা বিস্ফারিত হয়ে যায়। ঘুম কমে যায়, জ্বর হতে পারে। সাধারণত হেরোইন ছাড়ার ৬-৮ ঘণ্টা থেকে সাত দিনের মধ্যে উপসর্গগুলো আসে।

নেশা মুক্তির চিকিৎসা

ইনটক্সিকেশান (Intoxication) এবং উইথড্রয়াল (withdrawal) এর চিকিৎসা প্রয়োজন, ওষুধ দিয়ে এবং ভর্তি করে করতে হয়।

কিন্তু নেশা মুক্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা বাস্তবে কী অবস্থায়? সারা পৃথিবীতে মূলত বিভিন্ন অ্যান্টি-অ্যাডিকশান অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে এই চিকিৎসা হয়। কয়েকটা ওষুধ ব্যবহার করা হয় নেশার ইচ্ছা কমানোর, কিন্তু তাদের ফল আশাব্যঞ্জক নয়। পশ্চিমবঙ্গে অন্তত ১২০টি এরকম নেশা ছাড়ানোর সেন্টার আছে। মূলত নেশা-ছেড়ে-দিয়েছেন এমন প্রাক্তন নেশাড়ুরা এগুলো চালান। অনেকেই নিজের নেশাড়ু জীবন এবং নেশামুক্ত জীবনের উদাহরণ তুলে নেশাড়ুদের সামনে একটা বিকল্প পথের সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করেন। এখানে নেশাড়ুদের চব্বিশ ঘণ্টা একটা রুটিনে রাখা হয় এবং নানারকম মোটিভেশনাল প্রোগ্রাম করা হয়। এখানকার ব্যবস্থা অব্যবস্থা সব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাকল।

উড়তা পাঞ্জাব এবং ২৬ জুন

অনুরাগ কাশ্যপ একটা চলচ্চিত্র করেছেন, নাম 'উড়তা পাঞ্জাব'। পাঞ্জাবের যুব সমাজে নেশার শিকড় কত গভীর সেটাই নাকি সেখানে দেখানো হয়েছে। কিন্তু পহেলাজ নিহালনির সেন্টার বোর্ড ফিল্মটিকে কিছুতেই মুক্তি দিতে চাইছিল না। বক্তব্য—— অনেক অশ্লীল দৃশ্য আছে আর পাঞ্জাবে নেশার সমস্যা নাকি ততটা গভীর নয়। ডেপুটি চিফ মিনিস্টার তড়িঘড়ি বিবৃতি দিয়ে বলেছেন পাঞ্জাবে মাত্র শতকরা ০.০৬ জন লোক নেশা করে। এদিকে নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরোর রিপোর্ট বলছে ভারতবর্ষের মোট নেশাড়ুর শতকরা ৫০ ভাগ পাঞ্জাবে আছে। অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (AIIMS) -এর সাইকিয়াট্রি বিভাগ দেখিয়েছে পাঞ্জাবে ওপিয়াম অ্যাডিক্ট অন্তত শতকরা ০.৮৪ ভাগ মানুষ। কোনটা ঠিক?

যাইহোক সেন্সর বোর্ডকে চুপ করিয়ে সুপ্রিম কোর্ট সিনেমাটিকে মুক্তি দিয়েছে। এখন বিভিন্ন হলে চলছে।

এই লেখা বেরোতে বেরোতে ২৬ জুন পেরিয়ে যাবে। ২৬ জুন হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস। সেমিনার হবে, আলোচনা হবে, ভারী

এই পৃথিবীতে নেশার দ্রব্য নিয়ে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের ব্যাবসা হয় প্রতি বছর। পেট্রোলিয়াম ব্যাবসা আর অস্ত্র ব্যাবসার পরে সব থেকে অর্থকরী ব্যাবসা। জড়িয়ে আছে রাষ্ট্রনায়ক, নেতা, মন্ত্রী, আমলা, মাফিয়া, পুলিশ থেকে পাড়ার পেডলার।

ভারী কথা হবে। পুলিশের নারকোটিক সেল এই সময় খুব সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিভিন্ন অ্যান্টি-অ্যাডিকশান সেন্টারকে সচেতনতা বাড়ানোর প্রোগ্রাম করতে বলে। তারা করেও। ২৬ জুন আসে যায়। কিন্তু নেশার কুয়াশা সরে না। কেন?

এর উত্তরটা লুকিয়ে আছে ছোট্ট একটা তথ্যের উপর। এই পৃথিবীতে নেশার দ্রব্য নিয়ে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের ব্যাবসা হয় প্রতি বছর। পেট্রোলিয়াম ব্যাবসা আর অস্ত্র ব্যাবসার পরে সব থেকে অর্থকরী ব্যাবসা। জড়িয়ে আছে রাষ্ট্রনায়ক, নেতা, মন্ত্রী, আমলা, মাফিয়া, পুলিশ থেকে পাড়ার পেডলার। যেমন পাঞ্জাবে সরাসরি আঙুল উঠছে প্রভাবশালী মন্ত্রীর দিকে। রক্ষকই হচ্ছে এখানে ভক্ষক। ড্রাগ ব্যাবসার এই দুষ্টচক্র ভাঙা কঠিন। কিন্তু চেষ্টা তো করতে হবে। তাহলেই হয়তো নেশা মুক্ত পৃথিবী পাওয়া যেতে পারে।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সুমিত দাশ, এমবিবিএস, ডিপিএম, মনোরোগবিশেষজ্ঞ, একটি ডি-অ্যাডিকশন সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত। প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করেন।

গ্যাসের ব্যথার রহস্য

ডা. গৌতম মিস্ত্রী

গ্যাসের রহস্য কথা (অ) মৃত সমান।
গৌতম ডাক্তার কহে, শুনে পুণ্যবান।।

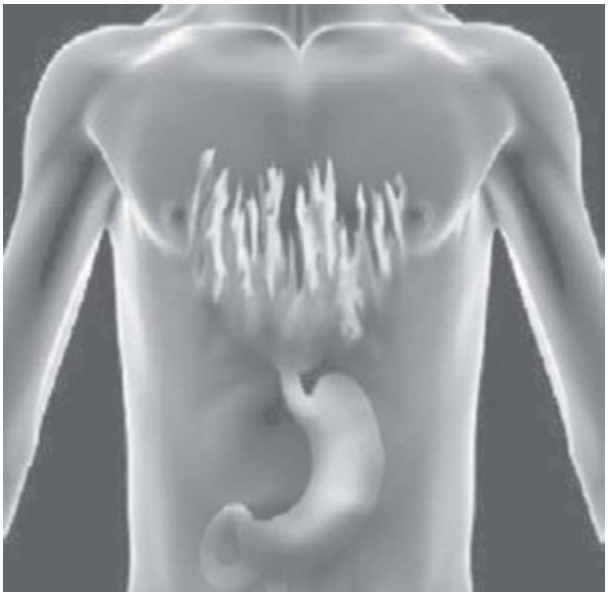

ডাকাবুকো গ্যাস-রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চেম্বারে সবসময় ভিড় লেগেই আছে। আর হবে নাই-বা কেন? ভারতবর্ষের পূর্ব দিকের এই বঙ্গভাষীদের দেশগুলোতে অনেক কিছুই আক্রা, কেবল গ্যাস ছাড়া। এই গ্যাসে কিচেনের ওভেন জ্বলে না এই এক দুঃখের বিষয়। প্রতিটি বঙ্গ-শরীরে পেটই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সকালে ঘুম থেকে ওঠামাত্র কমোডে ধ্যানে বসা থেকে দিন শুরু। বাঙালির বাথরুমে মাধ্যাকর্ষণ আশ্চর্যজনকভাবে কম। দমবন্ধ করে গলার শিরা ফুলিয়ে পরিত্যাজ্য বস্তুটিকে ধরাশায়ী করার চেষ্টা কোনোমতে আংশিকভাবেই সারা করতে হয়। ক্ষোভ করে লাভ নেই, নশ্বর জীবনে সাধনার ফল পুরোটা মেলে না! সারাদিন মুখে পেটের জলছাপ সাঁটা হয়ে থাকে। পৈটিক বিষয়টি অহোরাত্র চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। গ্যাসের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য সবরকম ওষুধপত্র, হাকিমি-

বাঙালির বাথরুমে মাধ্যাকর্ষণ আশ্চর্যজনকভাবে কম

কবিরাজি-হোমিওপ্যাথি-ইউনানি, তাবিজ-মাদুলি-হনুমান গুপীযন্ত্র, চৈনিক চুড়ি আর জড়িবুটি, মায় চৌরাস্তার মোড়ে 'ফোর-হুইলার'-এ সস্তায় কেনা চুরণ সব প্রয়োগ হতে থাকে। কোনো কিছুতেই ভুসভুসিয়ে ওঠা গ্যাসের প্রকোপ কমে না।

প্রশ্ন তিনটি। কেন এই গ্যাসের আধিক্য এই বাংলাদেশে, যেটা অন্য দেশে দেখা যায় না? এটা সত্যিই গ্যাস তো, কারণ তাকে কেউই চর্মচক্ষে দেখতে পায় না, কেবল অনুভব করে, ভূত বা ভগবানের মতো। কেষ্ট ঠাকুরের একই অঙ্গে শতসহস্র রূপের মতো গ্যাসের অস্তিত্ব বলে অসংখ্য শারীরিক কষ্টের কথা চালু আছে, তার সত্যতা কী? এই সব কঠিন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পরেই এর বৈজ্ঞানিক সমাধানের পথের কথা ভাবা যাবে। পাকস্থলীতে রোগজনিত কারণে কালেভদ্রে প্রয়োজনের চেয়ে (প্রয়োজন আছে বই কি) হাইড্রোক্লোরাইড অ্যাসিড নিঃসরণ হয়; সেটা ''অ্যাসিড পেপটিক ডিজিস''। সে অন্য আলোচনা, অন্য সময়ের জন্য।

কর্মসূত্রে ভারতের উত্তরপূর্ব অঞ্চলে কয়েক বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ওই অঞ্চলে এমন গ্যাসের রোগের প্রাদুর্ভাব দেখিনি। বঙ্গদেশীয় ও সমগোত্রীয় লোকের এই বৈশিষ্ট্য কি ছোঁয়াচে? তা না হলে পাঞ্জাব, বিহার বা দেশে অন্য প্রদেশের লোকজন বঙ্গভূমিতে এলেই কেন তাদের পেটেও এত বায়ুর আধিক্য? সত্যিই কি এসব গ্যাসের চাপ, না অন্য কিছু? এটাও শোনা যায়, ''জল খেলেও পেটে গ্যাস হয়।'' এটা সত্যি যে আমাদের পেটে বিভিন্ন উৎসেচকের দ্বারা খাবার-দাবারের প্রক্রিয়াকরণ হয়, অনেকটা রান্নাঘরের রান্না করার মতো। এতে স্বাভাবিকভাবেই পেটে কিছু গ্যাসীয় পদার্থের উদ্ভব হয়। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও কোনো রোগ নয়। এই গ্যাসের সিংহভাগের ঢেকুরের মাধ্যমে ও পায়ুদ্বারের নির্গম পথে নিঃসরণ ঘটে। সেটা বন্ধ করা যায় না, বন্ধ করাটা স্বাস্থ্যকরও নয়। কিন্তু চিকিৎসার জন্য দ্বারস্থ হওয়া উদ্বিগ্ন মানুষের সমস্যা অন্য।

গ্যাস যখন মাথায় ওঠে

কেবল মাথায়ই না, গ্যাস বুকে, পিঠে আর কোমরেও নাকি স্বচ্ছন্দে চলাচল করে বেড়ায়। অনেকের বক্তব্য, পেটের গ্যাস ঊর্ধ্বমুখী হয়ে বুকেও ধাক্কা মারে! মাথা ঘুরলেও অনেকে গ্যাসকেই ভিলেন ঠাউরে বসেন। অ্যানাটমি ডিসেকশন হলে, অপারেশনের টেবিলে বা পরীক্ষাগারে তন্ন তন্ন করে গোয়েন্দাগিরি করে বৈজ্ঞানিকগণ পেটের গ্যাসের ওই সকল জায়গাগুলোতে চলাচলের পথ খুঁজে পাননি। যে পথ নেই, সেটা খুঁজে পাননি বলে তাঁরা তেমন বিস্মিতও নন। কিন্তু এই কথা অসুস্থ রোগীকে বললে দেখা যায়, বেশ কিছুক্ষণ যুক্তির পথে হাঁটার পরেও রোগী শেষ অবধি তাঁর ভ্রান্ত বিশ্বাসে অটল থাকেন। কারণ হয়তো এই যে তাঁরা অ্যানাটমির তত্ত্বকথা প্রথমবার

এটা সত্যিই গ্যাস তো, কারণ তাকে কেউই চর্মচক্ষে দেখতে পায় না, কেবল অনুভব করে, ভূত বা ভগবানের মতো।

শুনছেন, কিন্তু বহুবার, বহুদিন ধরে ওষুধের দোকানদারের জবানিতে, গুজবে ও টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন দেখে তাঁর অন্য ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। এইখানে আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়, গ্যাস, অম্বল, কোষ্ঠকাঠিন্য এই সবই প্রায়

একই জিনিস, অন্তত মোটের ওপর একমাত্রিক বলে প্রচারিত হয় ওই বিজ্ঞাপনগুলোতে। এসবের ওষুধ সব ওষুধ-বিক্রেতারই জানা, অন্তত বিক্রি করার ওষুধটা জানা বই কি! রোগীদের অসত্য ধারণার সঙ্গে একমত হতে পারলেই খাটনি কম, ওষুধ বিক্রি বেশি। মাথাব্যথার, মাথা ঘোরার ও পিঠের ব্যথার কারণ যেহেতু কোনোমতেই গ্যাস থেকে হওয়া সম্ভব নয়, তাই অ্যান্টাসিডের বড়িতে ওই কষ্টের উপশম হয় না। গাদা গাদা অম্বলের ওষুধ খেয়েও তথাকথিত গ্যাস-অম্বলের কষ্ট একই মাত্রায় থেকে যায়।

একটা গুজব বহুযুগ ধরে চলতে থাকলে সেটা ক্রমশ ডাক্তারদেরও প্রভাবিত করতে থাকে। আমাদের দেশে কোনোক্রমে একবার মেডিক্যাল

অপারেশনের টেবিলে বা পরীক্ষাগারে তন্ন তন্ন করে গোয়েন্দাগিরি করে বৈজ্ঞানিকগণ পেটের গ্যাসের ওই সকল জায়গাগুলোতে চলাচলের পথ খুঁজে পাননি।

কলেজের (MBBS) চৌকাঠ পার করতে পারলে তাকে দ্বিতীয়বারের জন্য বইপত্র না খুললেও চলে। অন্যদিকে, বিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ ও ব্যস্ত ডাক্তার'রা রোগীকে বোঝানোর জন্য বিস্তর সময় ও খাটুনির 'অর্থ' খুঁজে পান না। বহুদিন চলে আসা ধারণার বিপরীত কিছুতে রোগীকে বিশ্বাস জাগানো কঠিন। বৈজ্ঞানিক ধারণায় বিশ্বাস জাগিয়ে, তারপর তার কষ্টের উপশম আরও দুরূহ। এতে কোনো পুরস্কার মেলে না, মেলে না এই খাটুনির কোনো স্বীকৃতি। অতএব, চলতে থাকে ক্রমবর্ধমান ভুল ধারণার প্রসার। ব্যক্তি থেকে পরিবারে, পরিবার থেকে আত্মীয় বন্ধুবর্গে, ডাক্তার থেকে তার সতীর্থে, শিক্ষক থেকে ছাত্রে। সত্যিকারের গ্যাস-এর ভৌত বৈশিষ্ট্যের মতো দ্রুতগতিতে গুজব-গ্যাসের এই সর্বগ্রাসী ব্যাপ্তি কোনো ভৌগোলিক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে না। যেকোনো অজানা বা জানা কিন্তু মারাত্মক রোগের কারণ হিসাবে আমরা গ্যাসকেই দোষী সাব্যস্ত করি। যেকোনো

বিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ ও ব্যস্ত ডাক্তার'রা রোগীকে বোঝানোর জন্য বিস্তর সময় ও খাটুনির 'অর্থ' খুঁজে পান না।

রোগীর প্রেসক্রিপশন খুঁটিয়ে দেখলেই দেখা যাবে, অ্যাসিড নিঃসরণ রোধকারী (প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর, এইচ-টু রিসেপ্টর ব্লকার) বড়ি তাতে থাকবেই। ডাক্তার নমনীয় হলে, তিনি প্রাথমিকভাবে না লিখলেও রোগী চেয়েচিন্তে ওটা প্রেসক্রিপশনে অন্তর্ভুক্ত করে নেবে। ওষুধের-নির্মাতাদের আর কী চাই! একটা দেশে যতটা অ্যাসিড নিঃসরণ রোধকারী বড়ি দরকার, তারচেয়ে বহুগুণ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে কোনোরকম প্রোমোশন ছাড়াই। মুড়িমুড়কির মতো পাকস্থলীর অ্যাসিড তৈরি বন্ধ করে দেওয়া শক্তিশালী অ্যাসিড নিঃসরণ রোধকারী ট্যাবলেটের ব্যবহার হয়ে যাচ্ছে। অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী তিন দশক আগের অ্যাসিড প্রশমনের অ্যান্টাসিড (অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড; শিশিতে তরল হিসাবে বিক্রি হয়) আজকাল জনপ্রিয় নয়। এইভাবেই চলতে থাকে মশা মারতে কামান দাগা, যদিও সেটা মশাও কিনা যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়। 'মশার কামড়' কিন্তু এতে কমে না। পেটের গ্যাস পেটেই থেকে যায়, আর ক্ষণে ক্ষণে মাথায়, ঘাড়ে, পিঠে ও শরীরের অদ্ভুত অদ্ভুত সব জায়গায় স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করতে থাকে! ওষুধ কোম্পানির মুড়ির বস্তা দ্রুতহারে বিক্রি হতে থাকে।

রোগীদের কষ্ট কমে কি?

একদিকে যেমন বুকের মধ্যে গ্যাস (অক্সিজেন) না থাকলে আমাদের অস্তিত্বের সংকট উপস্থিত হয়, তেমনি অন্য আর এক ধরনের গ্যাস পেটে থাকলে সেটা পেট থেকে বার করতে না পারলে স্বস্তি পাই না। বার করতে পারলেও অবশ্য জনসমক্ষে বড়ো বিড়ম্বনা। কিন্তু গ্যাসের রোগীদের অনেকের সমস্যা আদৌ পেটে নয়। বুকে ব্যথা বা মাথা ঘোরার কারণ হিসাবে অনেকেই গ্যাসকে ভিলেনের আসনে বসিয়ে দেয়। জানা কোনো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে গ্যাসকে ওই সকল কষ্টের কারণ হিসাবে পাবার উপায় নেই। সঙ্গত কারণেই যত রকম গ্যাস-প্রশমনকারী চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করা গেছে, সেই সব প্রয়োগে তাই ওই ভুল করে মনে করা

যতটা অ্যাসিড নিঃসরণ রোধকারী বড়ি দরকার, তারচেয়ে বহুগুণ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে কোনোরকম প্রোমোশন ছাড়াই।

গ্যাসের অলীক কষ্টের উপশম করা যায় না। এই ভুলের মহামারীতে রোগী, আপামর সাধারণ নাগরিক ও চিকিৎসকের একাংশ ভুল চিনতে অক্ষম হচ্ছে। যুক্তিপ্রিয় অনেক চিকিৎসকও অসত্য জেনেও, এর বিরুদ্ধে মত প্রতিষ্ঠা করার খাটনি বৃথা মনে করে অ্যাসিড নিঃসরণ রোধকারী ট্যাবলেট খাওয়ার নিদান দিয়ে সহজে কর্তব্য সেরে ফেলার লোভ সংবরণ করতে পারছেন না। রোগীর লাভ হোক বা নাই হোক, সে তো গ্যাসের বড়ি না পেলে ডাক্তার বদলাবে!

বুকে, পেটের ব্যথা বা মাথা ঘোরা তবে গ্যাসের নয়?

গ্যাসের রোগ বলে যে শারীরিক কষ্টসমূহ অসুস্থ ব্যক্তিরা উল্লেখ করে থাকেন সেগুলিকে প্রধানত দু-টি শ্রেণিতে ভাগ করে ফেলা যায়। আগে উল্লেখিত বুকে ব্যথা, পিঠে ব্যথা, মাথা ঘোরা, মাথা ব্যথা ইত্যাদি যে গ্যাস

রোগীর লাভ হোক বা নাই হোক, সে তো গ্যাসের বড়ি না পেলে ডাক্তার বদলাবে!

থেকে হতে পারে না, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ এটার উল্লেখ করতেই হল, কারণ পশ্চিমবঙ্গ ও তার চারপাশের সম-খাদ্য সংস্কৃতি অঞ্চলের মানুষের এক উল্লেখযোগ্য অংশ ওই শারীরিক কষ্টগুলোকেও গ্যাসের কষ্ট বলে মনে করে থাকেন। এই শ্রেণির কষ্টের অন্য কারণ থাকে; সে এক অন্য আলোচনা। আমরা এবার আসল গ্যাস, বা পেটের গ্যাসের আলোচনায় অগ্রসর হব।

পেটের গ্যাসের কথা!

পেটের গ্যাসের কষ্টকে আবার তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করে নিই।

১. অত্যধিক ও বিড়ম্বনাময় ঢেকুর তোলা;

২. পেটে এক ভারী ভারী ভাব, হালকা ব্যথা, যেন প্রচুর গ্যাস জমে আছে। কোনোমতে যেকোনো পথে গ্যাস বার করতে দিতে পারলেই যেন আরাম মিলবে।

৩. মলদ্বার দিয়ে গন্ধহীন এবং/অথবা দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস নির্গমন।

এই তিন ধরনের অবস্থায় (লক্ষ করা যাক, রোগ বলা থেকে বিরত থাকলাম) একমাত্র দ্বিতীয় অবস্থায়ই শারীরিক কষ্ট হতে পারে। মানুষের পৌষ্টিকনালীর উপরের অথবা নীচের ছিদ্র দিয়ে যত খুশি বায়বীয় পদার্থ বেরুক না কেন, তাতে কোনো কষ্ট হয় না। বড়োজোর কেউ কেউ উৎকণ্ঠিত হতে পারেন অথবা বিড়ম্বনায় পড়তে পারেন। সংস্কৃতিগত কারণে চিকিৎসকের সঙ্গে এই সংক্রান্ত কষ্টের আলোচনায় রোগী ঝেড়ে কাশতে লজ্জা পান। চিকিৎসকও হয়তো যথেষ্ট প্রশিক্ষিত থাকেন না, অথবা সময় সংক্ষেপ করার জন্য এড়িয়ে যান। খুঁতখুঁতে রোগী হলে (এই ধরনের কষ্ট বহুদিন ধরে ভোগায় বলে রোগী এমনটা হতেই পারেন), তখনকার মতো বিদায় করার জন্য (বা, রোগীকে হাতে রেখে ঘোরানোর জন্য) চিকিৎসককে হাতড়ে বেড়াতে হয় রোগীর অজানা আর একটা প্রোটন পাম্প ইনহিবিটরের। কারণ ততদিনে রোগীর বাজারের পরিচিত ওই ওষুধটির সব ব্র্যান্ড নামের ট্যাবলেট পরখ করে দেখা হয়ে গেছে। কিন্তু প্রোটন পাম্প ইনহিবিটরের (যেমন—ওমিপ্রাজোল, প্যান্টোপ্রাজোল, রাবেপ্রাজোল ইত্যাদি) এই গ্যাসের কোনো সুরাহা হবার কথাই নয়। হয়ও না। ঢেকুর তোলার সঙ্গে পেটে অত্যধিক গ্যাসীয় পদার্থ উৎপন্ন হবার কোনো সম্পর্ক নেই। যে সকল

কড়াইতে রান্নার সময় যদি গ্যাস তৈরি হতে পারে, পেটেই বা হবে না কেন?

কারণে ওই সব শারীরিক কষ্টগুলি হয় তার প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হল, খাবার বা পান করার সময় সাধারণভাবেই খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে অল্প অল্প করে কিছুটা করে বাতাস খেয়ে ফেলা। ঢোক গেলার প্রক্রিয়ার সঙ্গে, তার অবিচ্ছেদ্য ক্রিয়া হিসাবেই আমরা প্রত্যেকেই কিছু করে বাতাস খেয়ে থাকি। এটা ঘোরতর স্বাভাবিক। সোডা যুক্ত বা এয়ারেটেড পানীয়ের ক্ষেত্রে এটা বোধগম্যভাবে বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা সচেতনভাবে অনুভব করি না, কারণ এই বাতাস পাকস্থলী (stomach) ও অন্ত্র (intestine) থেকে রক্তে মেশে বা পায়ুদ্বার দিয়ে বেড়িয়ে যায়। ''এরোফেজিয়া'' নামে একটা অবসেসিভ মানসিক রোগ আছে, যাঁরা খাবার প্রক্রিয়ার সময় ছাড়া অন্য সময়েও অল্প অল্প করে নিঃশব্দে বা লঘু শব্দে খাদ্যনালীতে নাকের ফুটো ও মুখ দিয়ে হাওয়া টানার অদম্য ইচ্ছেয় লাগাম পড়াতে পারেন না। ফলে কিছুক্ষণ পরে পরে সেই বাতাস ঢেঁকুরের মাধ্যমে বার করতে থাকেন। এতে তাঁর কোনো শারীরিক ক্ষতি হয় না, কিন্তু তিনি বিড়ম্বনায় পড়েন এবং অন্য শারীরিক কষ্টের কারণ হিসাবে একে চিহ্নিত করে উপশম সেই রাস্তাতেই খুঁজে পেতে চান। এই রোগের কোনো ওষুধ হয় না, চিকিৎসা না করলে কোনো ক্ষতি হয় না। রোগীর মনঃকষ্ট নিবারণের জন্য তাকে বুঝিয়ে বলা দরকার, তাতে কাজ না হলে মনস্তত্ত্ববিদের সাহায্য দরকার।

অনেক সময় সত্যি সত্যিই পেটে স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশি গ্যাসীয় পদার্থের সৃষ্টি হয় বটে। খাদ্য ও পানীয়ের স্বাভাবিক পাচন ক্রিয়ায় বিভিন্ন গ্যাসের উদ্ভব হয়ে থাকে। আমাদের পেট হল ওভেনের ওপরে কড়াইয়ের মতো। তা, কড়াইতে রান্নার সময় যদি গ্যাস তৈরি হতে পারে, পেটেই বা হবে না কেন? শর্করা ও ডাল জাতীয় খাদ্যের স্বাভাবিক পাচন ক্রিয়ায় গ্যাস তৈরি হয়। সরল শর্করা (ওলিগোস্যাকারাইড) থেকে গ্যাসের উৎপত্তি একটু বেশি পরিমাণেই হয়।

খাবারের গেলার প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রতিটি গ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা করে পরিমণ্ডলের বাতাস পাকস্থলীতে ঢোকে। সেটা পেটের গ্যাসের একটা উৎস। অগ্ন্যাশয় (প্যানক্রিয়াস) থেকে শর্করা হজমের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে পাচক রসের নিঃসরণ প্রয়োজন। সেটার অভাব ঘটলে ''ম্যালঅ্যাবজর্পশন''

যে সকল ব্যক্তি পেটে গ্যাসের আধিক্যের অভিযোগ করে থাকেন তাদের পেটেও ওই একই পরিমাণে গ্যাসের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, বেশি নয়।

নামে বিরল একটা রোগ হয়। আবার বিভিন্ন কারণে পৌষ্টিক নালীতে কিছু বিরল রোগের জন্য খাদ্যনালী আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গিয়ে (intestinal obstruction) আংশিকভাবে পাচিত খাদ্য অন্ত্রে (পৌষ্টিকনালীর যে অংশে খাবার শোষিত হয়) জমে থাকে। এই জমে থাকা আংশিকভাবে পাচিত খাদ্য প্রচুর খাদ্য সৃষ্টি করে। (প্রবন্ধ শেষে সারণি দেখুন)।

প্লেথিস্মোগ্রাফি (plethysmography) ও আর্গন গ্যাস ওয়শ আউট পদ্ধতিতে হিসেব কষে বৈজ্ঞানিকগণ নির্ণয় করেছেন, খালিপেট অবস্থায় ও খাওয়ার অব্যবহিত পরে স্বাভাবিকভাবে মানুষের খাদ্যনালীতে গড়পড়তা ২০০ মিলিলিটার গ্যাস থাকে।[১,২] যে সকল ব্যক্তি পেটে গ্যাসের আধিক্যের অভিযোগ করে থাকেন তাদের পেটেও ওই একই পরিমাণে গ্যাসের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, বেশি নয়।[৩] পেটের এক্স-রে করে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানও এই তথ্যকে সঠিক বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে।[৪]

পেটের গ্যাসের উপাদান

পায়ুদ্বার দিয়ে নির্গত গ্যাসের বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এর ৯৯ শতাংশ হল নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন এবং মিথেন। অন্যভাবে পরীক্ষায় স্বাভাবিক ব্যক্তিদের পেটের মধ্যেকার গ্যাস মূলত নাইট্রোজেন বলে নির্ণীত করা গেছে, যদিও অল্প মাত্রায় অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন এবং মিথেন থাকে।[১] অন্যান্য গ্যাসের মাত্রা অন্ত্রের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পাকস্থলীতে (stomach) বায়ুমণ্ডলের মাত্রার মতো নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন থাকে আর পায়ুদ্বার দিয়ে নির্গত গ্যাসে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গিয়ে মিথেনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই সকল কোনো গ্যাসেই দুর্গন্ধ থাকে না। পায়ুদ্বার দিয়ে নির্গত গ্যাসের (flatus) বিশেষ গন্ধের কারণ হিসাবে সালফার যুক্ত যৌগকে (methanethiol, dimethyl sulfide, hydrogen sulfide)

আর ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের ফ্যাটি অ্যাসিড সমূহ, স্কেটোল (skatol),ইন্ডোল (indol), অ্যামোনিয়া (ammonia) ও বাষ্পীভূত অ্যামাইনকে (volatile amine) দায়ী করা হয়। [৪,৫]

পেটের গ্যাসের উৎস

হাওয়া খাওয়া (aerophagia)—খাবার খাওয়ার সঙ্গে ফাউ হিসাবে বিনি পয়সায় আমরা প্রচুর পরিমাণে পরিমণ্ডলের বাতাস খেয়ে থাকি। এই হাওয়ার অক্সিজেন রক্তে মিশে যায়, পড়ে থাকে নাইট্রোজেন-প্রধান গ্যাস। ব্যক্তিবিশেষের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই গ্যাসের বেশ কিছুটা ঢেকুর তুলে পরিমণ্ডলকে ফেরত দিয়ে দিই তৎক্ষণাৎ। বাকিটা পাকস্থলী থেকে অন্ত্রের গোলোকধাঁধায় প্রবেশ করে রোলার কোস্টার রাইডের জন্য। এটা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক নয় মোটেই। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে, মিছিমিছি চিবানোর অভ্যাস থাকলে (gum chewing), ধূমপান করলে এই খেয়ে ফেলা বাতাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় খেয়ে নেওয়া বাতাস পাকস্থলীতেই পৌঁছায় না, পাকস্থলীর উপরের অংশ, ইসোফেগাস (oesophagus) থেকেই ঢেঁকুরের মাধ্যমে মুক্তি পায়। খাবার অব্যবহিত পরে শুয়ে পড়লে পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্র (small intestine) শরীরের উপরের দিকে থাকার জন্য খেয়ে ফেলা হাওয়া সহজে পাকস্থলী থেকে ক্ষুদ্রান্ত্রে চালান হয়ে যেতে পারে। সর্বোপরি অন্ত্রের বিভিন্ন অংশের গায়ের রক্তনালীর মধ্যেকার দ্রবীভূত মৌলিক ও যৌগিক গ্যাসের নিজস্ব চাপ (partial pressure) অন্ত্রের মধ্যকার ওই সকল গ্যাসের চাপের বেশি হলে রক্তের গ্যাস ''ডিফিউশন'' প্রক্রিয়ার দ্বারা অন্ত্রে ঢুকে পড়ে।

তা হলে পেটের মধ্যে খাদ্য খাবার থেকে কি গ্যাস তৈরি হয় না?

অবশ্যই হয়। খাবারের সঙ্গে গিলে নেওয়া বাতাসের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন তো পেটে ঢুকছেই। খাবারের পাচন প্রক্রিয়ায় এ দু-টি ছাড়া মূলত তিন ধরনের গ্যাস তৈরি হয়।

১. কার্বন ডাইঅক্সাইড

কার্বন ডাইঅক্সাইড-হাইড্রোজেন ও মিথেন খাবার থেকেই হয়। স্নেহ জাতীয় (fat) ও প্রোটিন জাতীয় খাবার পাচন প্রক্রিয়ার যে অংশ খাদ্যনালীর উপরের ভাগে হয় সেখানে অন্ত্রের স্বাভাবিক মিত্ররূপী জীবাণুর (রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু নয়) সংস্পর্শে (fermentation) ও অ্যাসিডের সঙ্গে বাইকার্বোনেটের বিক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়।[৬] এইভাবে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রস্তুত কার্বন ডাইঅক্সাইড বৃহদন্ত্রে পৌঁছোনোর আগেই রক্তে মিশে গিয়ে পেট হালকা করে দেয়। হজম না হওয়া খাদ্যের অবিকৃত কার্বোহাইড্রেট সরাসরি বৃহদন্ত্রে চলে যায়। সেই হজমের অযোগ্য কার্বোহাইড্রেট থেকে বৃহদন্ত্রে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয় সেটাই পায়ুদ্বার থেকে গ্যাসের সিংহভাগ।[৭]

২. হাইড্রোজেন

হাইড্রোজেন মূলত বৃহদন্ত্রেই উৎপন্ন হয়। কখনো কখনো ক্ষুদ্রান্ত্রে জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সেখানে হাইড্রোজেন তৈরি হয়ে থাকে।[৮] খাবারের শর্করা আর প্রোটিনই হাইড্রোজেন গ্যাসের উৎস। বিরল কার্বোহাইড্রেট

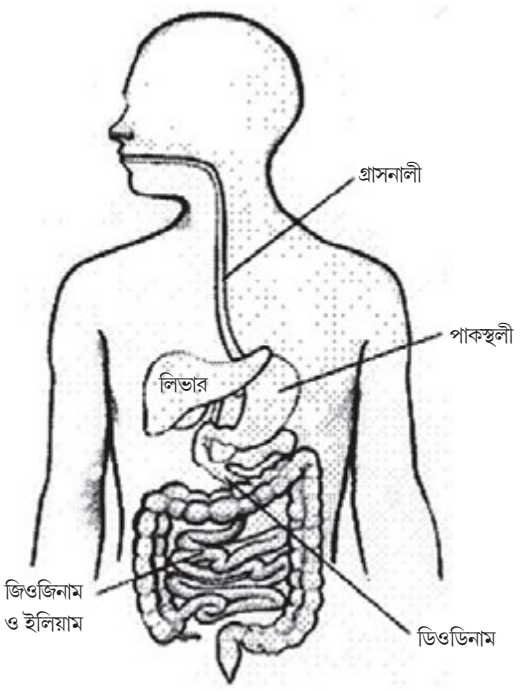

চিত্র ১. খাদ্যনালী ও পরিপাকতন্ত্র

'ম্যালঅ্যাবজর্পশন" নামে ক্ষুদ্রান্ত্রের রোগ ও যেকোনো ডায়রিয়া রোগে প্রচুর পরিমাণে অপাচ্য কার্বোহাইড্রেট বৃহদন্ত্রে পৌঁছে গেলে তা থেকে হাইড্রোজেন প্রস্তুত হতে পারে অনায়াসে। সুস্থ মানুষের খাদ্যে স্ট্যাকোজ (stachyose) এবং র‍্যাফিনোজ (raffinose) জাতীয় ওলিগোস্যাকারাইড (ডাল বা লেগুম থেকে পাওয়া যায়) অথবা অপাচ্য শর্করা (আটা, ওটস, আলু, ভুট্টায় আছে) সম্পূর্ণভাবে আন্ত্রিক জারক রস হজম করতে পারে না। এই ধরনের খাবার বৃহদন্ত্রে হাইড্রোজেন প্রস্তুতের কাঁচামাল।[৯] বৃহদন্ত্রের হাইড্রোজেনের একাংশ রক্তে মিশে ফুসফুসে পৌঁছে যায় ও প্রশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। প্রশ্বাসের গ্যাসের বিশ্লেষণ করে হাইড্রোজেনের মাত্রা নিরূপণ করে অন্ত্রে ম্যালঅ্যাবজর্পশনের অস্তিত্ব নির্ণয় ও পরিমাপ করা যায়।[১০] বৃহদন্ত্রের জীবাণুরা একদিকে যেমন হাইড্রোজেন প্রস্তুত করে আবার ব্যবহারও করে থাকে, এই দুইয়ের ভারসাম্যে পায়ুদ্বার থেকে নির্গত গ্যাসে হাইড্রোজেনের মাত্রা নির্ধারিত হয়।

৩. মিথেন ও অন্যান্য গ্যাস

এইমাত্র উল্লেখ করা হল, বৃহদান্ত্রের জীবাণুগুলি হাইড্রোজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে মিথেন, সালফাইড ও অ্যাসিটেট তৈরি করে। এর মধ্যে মিথেনই প্রধান গ্যাস ($4H_2 + CO_2 = CH_4$ (methane) + $2H_2O$)।[১১] এই প্রক্রিয়ার গ্যাসের আয়তন হ্রাস পায়। প্রস্তুত হওয়া মিথেনের একটা বড়ো অংশ রক্তের মাধ্যমে (পোর্টাল সারক্যুলেশন) লিভারে চালান হয়ে যায় আর ফুসফুসে পৌঁছে প্রশ্বাসের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। যেটা রক্তে মিশতে পারে না, পায়ুদ্বার দিয়ে নির্গত হয়। মিথেন প্রস্তুতকারী জীবাণু বা মিথানোজেনের পরিমাণের উপর মিথেনের প্রস্তুত হওয়ার পরিমাণ নির্ভরশীল। মিথানোজেনের মাত্রা জিনগতভাবে ও পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের

উপর নির্ভর করে।[১২] প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, কোলোনের ক্যান্সার, অধিক মাত্রার আলসারেটিভ কোলাইটিস, কোলোনের নিরীহ টিউমার (পলিপ, ক্যান্সার নয়) ও কোলোনের অনান্য কিছু রোগে পায়ুদ্বার দিয়ে নির্গত গ্যাসে মিথেনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।[১৩]

গ্যাস যখন সত্যি রোগ

অধিকাংশ ক্ষেত্রে পেটের গ্যাস নিরীহ জৈবিক প্রক্রিয়া। কালেভদ্রে সেটা সত্যিকার রোগের লক্ষণ হিসাবে প্রকাশ পায়। বাংলাভাষায় বদহজম শব্দের ব্যাপ্তি বিশাল আর অস্পষ্ট। অথচ সোজাসুজি মানে খুঁজলে ম্যালঅ্যাব-জর্পশনের অর্থ (mal = বিঘ্নিত = বদ + absorption = পুষ্টি আত্মস্থ করা = হজম) বদহজম হওয়া উচিত। সেই অর্থে জারক রসের অপ্রতুলতায় এই বিশেষ বিরল রোগের জন্যে শর্করা বদহজমে প্রচুর আন্ত্রিক গ্যাস তৈরি হওয়াটা স্বাভাবিক। অপাচ্য শর্করা অন্ত্রের জীবাণুর উপস্থিতিতে ''গেঁজে গিয়ে'' (fermentation) কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে। আবার, আন্ত্রিক জারক রসের অভাব না ঘটলেও ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম (irritable bowel syndrome) রোগে অন্ত্রে অর্ধপাচ্য খাদ্য (মূলত কার্বোহাইড্রেট) অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে চলাচল করে। ফলে কার্বোহাইড্রেট রক্তে শোষিত হবার কম সময় পায় ও ওই একইভাবে আন্ত্রিক গ্যাস তৈরি করে। দ্রুতগতিতে চলাচল করা খাদ্যের সঙ্গে গ্যাসের গা ঘষাঘষির গুড়গুড় শব্দও শোনা যায় পেটে কান পেতে শুনলে। ল্যাক্টেজ নামক একটি জারক রস দুধের ল্যাক্টোজ শর্করার হজমের জন্য অপরিহার্য। এই জারক রস শৈশবের পরে প্রায়শই কমে যায়, হয়তো জীব বিবর্তনের বর্তমান অধ্যায়ে শৈশবের পরে

অধিকাংশ পরিণত বয়স্ক মানুষেরই ল্যাক্টেজের মাত্রা যথেষ্ট কম থাকে; তাদের ''ল্যাক্টোজ অসহিষ্ণু'' বা ল্যাক্টোজ ইন্টলেরেন্স আছে বলা হয়।

মানুষের দুধ পান করাটা অপ্রয়োজনীয় বলে। অধিকাংশ পরিণত বয়স্ক মানুষেরই ল্যাক্টেজের মাত্রা যথেষ্ট কম থাকে; তাদের ''ল্যাক্টোজ অসহিষ্ণু'' বা ল্যাক্টোজ ইন্টলেরেন্স আছে বলা হয়। তাঁরা দুধ পান করলেও গ্যাসের আধিক্য ঘটবে। দই বা ছানা খেলে অবশ্য এমনটা হবে না, কারণ ওইসবে ল্যাক্টোজ থাকে না। শর্করা আর দুধের মতো ততটা বেশি না হলেও অনেককে ফ্রুক্টোজ হজমেও নাকাল হতে হয়। দেখা গেছে, পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ একসঙ্গে ২৫ গ্রামের বেশি ফ্রুক্টোজ হজম করতে পারে না, যদিও মানুষ দিনে গড়পড়তা ১১ থেকে ৫৪ গ্রাম ফ্রুক্টোজ খেয়ে থাকেন।[১৪-১৮]

গ্যাস থেকে পরিত্রাণ কীভাবে?

গ্যাসের তত্ত্বকথা অনেক হল। বায়বীয় জ্ঞানগম্যি বাষ্পীভূত হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তাহলে পেটে রইল কী? সোজা কথায় সারমর্ম নিবেদন—পেটের গ্যাসের প্রায় তিন-চতুর্থাংশের উৎপত্তি 'মস্তিষ্কে'। মাথা ঘোরা, ঘাড়ে ব্যথা, বুকে ব্যথা, পিঠে ব্যথা, পেটে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যথার কারণ আর যা কিছুই হোক না কেন, সেটার ভিলেন গ্যাস মোটেই নয়। ওই সব স্থানে গ্যাসের ব্যথা সৃষ্টি করার ক্ষমতাই নেই। গ্যাসের ব্যথার এই অনুমান নেহাতই মস্তিষ্কপ্রসূত ও ভ্রান্ত। খেয়াল করলে দেখা যাবে, এই অসুস্থতায় পেটে কোনো কষ্ট থাকে না। পাকস্থলী ও খাদ্যনালীর (oesophagus) নিম্নভাগে হাইড্রোক্লোরাইড অ্যাসিডের প্রভাবে যে ক্ষত বা প্রদাহজনিত ব্যথা হয় (acid peptic disease, gastric / peptic ulcer), সেটার জন্যও গ্যাস দায়ী নয়। ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোমের জন্য যে গ্যাসের উৎপত্তি হয়, সেটার মুখ্য কারণ মানসিক উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা।

ভ্রান্ত অনুমান-নির্ভর কষ্টকল্পনার গ্যাস অবশ্য স্থানীয় ধারণা; যেটা জনশ্রুতি, গুজব ও সুচতুর ব্যাবসায়িক প্রচার অনুযায়ী স্থানভেদে ফারাক হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে রোগীর সঙ্গে কিঞ্চিৎ যুক্তিপূর্ণ শরীরের অ্যানাটমি ও গ্যাসের ফিজিয়োলজি আলোচনা সেরে ফেলে আসল ব্যথার রোগনির্ণয় করে তার সফল প্রশমন করাটা জরুরি। ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোমের গ্যাসের কষ্ট নিবারণের জন্য তার যথাযথ চিকিৎসার সঙ্গে মানসিক উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তার দিকটাও দেখতে হবে। বদহজমের (mal-absorption) গ্যাস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ কোনো কষ্টের উদ্রেক করে না। কালেভদ্রে পেটের গ্যাস যদি বিড়ম্বনার কারণ হয় তবে প্রথমে দরকার এই গ্যাসের নিরীহ স্বভাব বুঝিয়ে বলা। প্রয়োজন হলে উপযুক্তভাবে খাবারের উপাদান নিয়ন্ত্রণ করে ফল মিলতে পারে। সত্যি কথাটা হল, সরাসরি গ্যাস শুষে নেওয়ার কোনো নির্ভরযোগ্য ওষুধই নেই। এটা বলাই বাহুল্য, যে রোগের সঠিক ওষুধ নেই, তার হাজারটা অকাজের ওষুধ থাকে—যেমন সক্রিয় চারকোল, সায়ামেথিকোন ইত্যাদি। এগুলো বিশেষ কাজের নয়। পেটের গ্যাসের অস্তিত্ব প্রাকৃতিক, ব্যক্তিভেদে বেশি আর কম। পদার্থের এই বায়বীয় অবস্থাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়ে অন্য কাজকর্মে নিজেকে ব্যস্ত রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

যে গ্যাসের রোগ চিকিৎসক হেলা করবেন না

এই সব রোগলক্ষণ থাকলে অত্যধিক পেটের গ্যাসের সমস্যায় চিকিৎসক বিশেষ যত্ন নিয়ে রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করবেন:

১. মাঝরাতে পেটে ব্যথা;
২. শরীরের ওজন কমে যাওয়া;
৩. মলের সঙ্গে রক্তক্ষরণ হওয়া
৪. পেট টিপলে প্রচণ্ড ব্যথা;
৫. জ্বর;
৬. বমি;
৭. নতুন করে শুরু হওয়া পাতলা ও ঘন ঘন পায়খানা (ডায়রিয়া);
৮. মলের সঙ্গে দৃশ্যমান ফ্যাট মিশে থাকা (জলে ভাসে)।

গ্যাস যখন মৃত্যুসম

সবশেষে গ্যাসের ব্যথার এক করুণ কাহিনি দিয়ে শেষ করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পেরিয়ে সবে ডাক্তারি করা শুরু করেছি। দিনশেষে ঘরে ফেরার পর এক প্রবীণ প্রতিবেশী এলেন, ই.সি.জি. করার জন্যে। ভদ্রলোক পেশায় সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক। ওঁর সকাল থেকে বুকের ব্যথা হচ্ছিল। চিকিৎসা পরামর্শ নেবার জন্য উনি আসেননি। বুকের ব্যথার কারণ যে ''গ্যাস'' সেটা উনি নির্ণয় করেই ফেলেছেন। ওঁর বিবেচনায় ই.সি.জি. কেবল নিয়মমাফিক পরীক্ষা। হরেকরকম গ্যাস-অম্বলের ওষুধের প্রয়োগ উনি চালু করে দিয়েছেন। ই.সি.জি. করে দেখি ওঁর অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল

ইনফারকশন (হার্ট অ্যাটাক) হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগেই। এরপর অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতাল ইত্যাদি। উনি তিনদিন বেঁচে ছিলেন। গ্যাসের ব্যথার ভ্রান্ত ধারণা প্রাণান্তকরও হয়।

সুতরাং, ব্যথাকে বিনা বিশেষণে, নিজের ধারণাপ্রসূত নামকরণ ছাড়াই চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। আপনার ব্যথা ও কষ্টকে না জেনে 'গ্যাসের জন্য' তকমা আঁটবেন না। আপনি রোগ ধরে দিলে দায়িত্বের বোঝা আপনার কাঁধেও কিছুটা পড়ে। গ্যাস ফানুসের জনপ্রিয় আবেদনে সদাব্যস্ত চিকিৎসক প্রভাবিত হয়ে গেলে আপনার লাভ নেই, ক্ষতি আছে। উনি হয়তো-বা আসল কারণ খোঁজার চাইতে গ্যাস দূর করার সহজ কাজটাই করবেন— সে কাজের জন্য ডাক্তারি জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। ওষুধের দোকানদার

সরাসরি গ্যাস শুষে নেওয়ার কোনো নির্ভরযোগ্য ওষুধই নেই। এটা বলাই বাহুল্য, যে রোগের সঠিক ওষুধ নেই, তার হাজারটা অকাজের ওষুধ থাকে

একজন চিকিৎসকের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক প্রচলিত গ্যাস-তাড়নের বড়ির সন্ধান জানে। ডাক্তারকে বলুন ঠিক কী কষ্ট হচ্ছে আপনার। কষ্টের কারণ অনুসন্ধানের জন্যই উনি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। আর আপনিও সবকিছুর জন্য গ্যাসকে ভিলেন ঠাওরানোর হাত থেকে বাঁচুন। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. গৌতম মিস্ত্রী, এমবিবিএস, এমডি, ডিএম, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

সারণি

যে সকল কারণে পেটে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি গ্যাস তৈরি হয়

- অন্ত্রে খাদ্য চলাচলের বাঁধা (Intestinal obstruction)
- টিউবারক্যুলোসিস বা অন্য কারণে অন্ত্র সরু হয়ে যাওয়া
- অন্ত্র বা তার গায়ে লেগে থাকা অঙ্গের ক্যান্সার (Malignancy)
- খাদ্যনালীতে খাদ্য চলাচল নিয়ন্ত্রণের রোগ (Mobility disorder)
- ডায়াবেটিস
- স্ক্লেরোডারমা (Scleroderma)
- ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া
- ইরিটিবল বাওয়েল সিন্ড্রোম
- ম্যালঅ্যাবজর্পশন (Malabsorption)
- ল্যাক্টেজ ইনটলারেন্স
- ফ্রুক্টেজ ইনটলারেন্স
- সিলিয়াক ডিজিস (coeliac disease)
- অগ্ন্যাশয়ের পাচক রসের অপ্রতুলতা (Pancreatic insufficiency)
- সংক্রমণের রোগ (Infectious disease)
- অন্ত্রে রোগজীবাণুর আধিক্য (Bacterial overgrowth in small intestine)
- জিয়ার্ডিয়াসিস (Giasdiasis)
- মানসিক দুশ্চিন্তার রোগ (খাবার খাওয়ার সময় বাতাস গেলার রোগ বা aerophagia)
- খাদ্য বৈশিষ্ট্যগত কারণে

সূত্রপঞ্জি

1. Lasser RB, Bond JH, Levitt MD. *The role of intestinal gas in functional abdominal pain*. N Engl J Med 1975; 293:524
2. BEDELL GN. MARSHALL R, DUBOIS AB, HARRIS JH. Measurement of the volume of gas in the gastrointestinal tract; values in normal subjects and ambulatory patients. J Clin Invest 1956; 35:336.
3. Tomlin J, Lowis C, Read NW. Investigation of normal flatus production in healthy volunteers. Gut 1991; 32:665.
4. Koide A, Yamaguchi T. Odaka T, et al. Quantititative analysis of bowel gas using plain abdominal radiograph in patients with irritable syndrome. Am J Gastroenterol 2000; 95:1735.
5. Moore JG, Jesssop LD, Osborne DN, Gas-chromatographic and mass-spectrometric analysis of the odor of human feces. Gastroenterology 1987; 93:1321.
6. Levitt MD, Intestinal gas production. J Am Diet Assoc 1972; 60:487.
7. Steggerda FR. Gstrointestinal gas following food consumption. Ann N Y Acad Sci 1968; 150:57.
8. Levitt MD. Production and excretion of hydrogen gas in man. N Engl J Med 1969; 281:122.
9. Olesen M, Rumessen JJ, Gudmand -Hoyer E. Intestinal transport and fermentation of resistant starch evaluated by the hydrogen breath test. Eur J Clin Nutr 1994; 48:692.
10. Newcomer Ad, McGill DB, Thomas PJ, Hofmann AF. Prospective comparison of indirect methods for detecting lactase deficiency. N Engl J Med 1975; 293:1232.
11. Pique JM. Pallares M, Cuso E, et al. Methane production and colon cancer. Gastroenterology 1984; 87:601.
12. Lajoie SF, Bank S, Miller TL, Wolin MJ. Acetate production from hydrogen and [13C] carbon dioxide by the microflora of human feces. Appl Environ Microbiol 1988; 54 : 2723.
13. Gibson PR, Newnham E, Barrett JS, et al. Review article: fructose malabsorption and the bigger picture. Aliment Pharmacol Ther 2007; 25:349.
14. Choi YK, Johlin FC Jr, Summers RW, et al. Fructose intolerance : an under-recognized problem. Am J Gastroenterol 2003; 98:1348.
15. Ravich WJ, Bayless TM, Thomas M. Fructose: incomplete intestinal absorption in humans. Gastroenterology 1983; 84:26.
16. Rumessen JJ, Gudmand-Hoyer E. Functional bowel disease: malabsorption and abdominal distress after ingestion of fructose, sorbitol, and fructose-sorbitol mixtures. Gastroenterology 1988; 95:694.
18. Nelis GF, Vermeeren MA, Jansen W. Role of fructose-sorbitol malabsorption in the irritable bowel syndrome. Gastroenterology 1990; 99:1016.

মলদ্বার দিয়ে রক্তপাত

পায়খানা করার সময় কাঁচা রক্ত পড়ছে? হয়তো পায়খানা কষে গিয়ে মলদ্বার চিরে গেছে অথবা হয়তো অর্শ হয়েছে। যাই হোক না কেন, ডাক্তার দেখানোর ব্যাপারে অবহেলা করবেন না। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস-এর রোগীদের জন্য তথ্যপুস্তিকা অবলম্বনে লিখছে *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র **সম্পাদকীয় দল**।

মলদ্বার দিয়ে কাঁচা রক্ত পড়ার মানে—মলদ্বারের কাছেই কোথাও থেকে রক্ত আসছে। রক্ত গাঢ় রঙের ও আঠালো হলে বুঝতে হবে খাদ্যনালীর ওপর দিকে কোনোখান থেকে রক্ত আসছে। আলকাতরার মতো কালো, আঠালো মল (malaena) হলে অবহেলা না করাই ভালো, হয়তো পেপটিক আলসার থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, দেরি করলে বিপদ হতে পারে।

ডাক্তারের কাছে মলদ্বার দিয়ে রক্তপাতের সমস্যা নিয়ে গেলে, তাঁর rectal examination বা মলাশয় পরীক্ষা করার কথা। গ্লাভস পরা ডান হাতের তর্জনী ঢুকিয়ে তিনি অনুভব করেন, তারপর প্রোক্টোস্কোপ (proctoscope) নামের ছোটো নল ঢুকিয়ে আলো ফেলে দেখেন। অবশ ও পিচ্ছিল করার জন্য লিগনোকেন (lignocaine) মলম লাগিয়ে যত্নের সঙ্গে

ডাক্তারের কাছে মলদ্বার দিয়ে রক্তপাতের সমস্যা নিয়ে গেলে, তাঁর rectal examination বা মলাশয় পরীক্ষা করার কথা।

করলে এতে ব্যথা লাগার কথা নয়। (অনেক জেনারেল ফিজিশিয়ান বা অন্য বিষয়ের বিশেষজ্ঞ অবশ্য এই পরীক্ষা নিজে না করে সার্জনের কাছে পাঠিয়ে দেন, এমনটা বাঞ্ছনীয় নয়)।

মলাশয় পরীক্ষা করে রক্তপাতের উৎস না পাওয়া গেলে কোলোনোস্কোপি (colonoscopy)-র মতো কোনো পরীক্ষা করে দেখতে হতে পারে।

মলদ্বার দিয়ে রক্ত পড়লে অনেকে চিন্তা করেন অন্ত্রের ক্যানসার হল না তো! অন্ত্রের ক্যানসারের প্রথম অবস্থায় মলদ্বার দিয়ে রক্ত পড়তেই পারে, তবে তা ছাড়াও অন্য উপসর্গে ডাক্তারের এমন সন্দেহ হতে পারে। যেমন কিনা মলদ্বার দিয়ে রক্ত পড়ার সঙ্গে—

- আপনার বয়স ৪০ বছর বা তার বেশি, গত ছয় সপ্তাহ ধরে বেশি বার বা বেশি পাতলা পায়খানা হচ্ছে।
- আপনার বয়স ৬০ বছর বা তার বেশি আর ছয় সপ্তাহ বা তার বেশি সময় ধরে মলদ্বার দিয়ে রক্ত পড়ছে।
- আপনার জেনারেল ফিজিশিয়ান আপনাকে পরীক্ষা করার সময়ে তলপেটে বা মলদ্বারের কাছে কোনো গোলা বা মাংসপিণ্ড পেয়েছেন।
- আপনার রক্তাল্পতাও আছে।
- পরিবারে কারোর অন্ত্রের ক্যানসার হওয়ার ইতিহাস আছে।
- আপনার আলসারেটিভ কোলাইটিস আছে।

বৃহদন্ত্রের কোথায় ক্যানসার আছে তার ওপর নির্ভর করে কোলোন ক্যানসার বা রেক্টাল ক্যানসার বলা হয়।

প্রাপ্তবয়স্কদের মলদ্বার দিয়ে রক্ত পড়ার সাধারণ কারণগুলো এরকম:

(এই বর্ণনা পড়ে কিন্তু নিজে রোগ-নির্ণয় করার চেষ্টা করবেন না। মলদ্বার দিয়ে রক্ত পড়লে অবশ্যই ডাক্তার দেখাতে হবে)।

এই বর্ণনা পড়ে কিন্তু নিজে রোগ-নির্ণয় করার চেষ্টা করবেন না। মলদ্বার দিয়ে রক্ত পড়লে অবশ্যই ডাক্তার দেখাতে হবে

- অর্শ বা Piles: এ রোগে মলাশয়ের রক্তনালীগুলো ফুলে ওঠে। মলত্যাগ করার সময় এই ফুলে ওঠা রক্তনালী থেকে রক্ত পড়তে পারে। মলের গায়ে রক্ত লেগে থাকতে পারে বা মলত্যাগ করার পর ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়তে পারে। অর্শের কারণে মলদ্বারের চারপাশে চুলকানি হতে পারে। অর্শ অনেক সময় আপনাআপনি সেরে যায়। অনেক সময় অর্শে ইঞ্জেকশন লাগিয়ে রক্তনালীগুলোকে শুকিয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়া রাবার ব্যান্ড দিয়ে বেঁধে, জ্বালিয়ে বা কেটে বাদ দিয়েও চিকিৎসা করা হয়। কখন কী করা হয় তা নিয়ে আলোচনা এই প্রবন্ধের আওতার বাইরে।
- মলদ্বারে চির বা Anal Fissure: মলদ্বারের চামড়ায় ছোটো একটা চেরা, সাধারণত কষে যাওয়া মল বেরোনোর সময় আঘাত লাগার কারণে। ব্যথা থাকে, কেননা এখানকার চামড়া খুব অনুভূতিপ্রবণ। সাধারণত উজ্জ্বল লাল রক্ত পড়ে আর অল্প সময়ের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। পেট খালি থাকলেও পায়খানা পেতে থাকে। বেশির ভাগ সময় কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আপনা থেকে এই চির সেরে যায়, কিন্তু মলকে নরম রাখতে হয়।

Anal Fissure: মলদ্বারের চামড়ায় ছোটো একটা চেরা

- ভগন্দর বা Anal Fistula: মলাশয় ও মলদ্বারের পাশের চামড়ার মধ্যে তৈরি হওয়া নালী ঘা। নালী ঘা-তে জীবাণুসংক্রমণ হলে ব্যথা হয় এবং পায়খানা করার সময় রক্ত পড়তে পারে।
- অন্ত্রে অস্বাভাবিক রক্তনালী গঠন বা Angiodysplasia: এ থেকে রক্ত পড়তে পারে। বৃদ্ধ বয়সে এমনটা বেশি দেখা যায়। রক্ত পড়ার সময় ব্যথা থাকে না।

➢ আন্ত্রিক বা Gastroenteritis: পাকস্থলী ও অন্ত্রের জীবাণুসংক্রমণ (ভাইরাস বা ব্যাকটিরিয়া থেকে)। সাধারণত শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতায় কয়েকদিনের মধ্যে ভালো হয়ে যায়। এ থেকে ডায়রিয়া হতে পারে, মলে রক্ত আর আম (mucus) থাকতে পারে। বমি হতে পারে। পেট কামড়ে ব্যথা হতে পারে।

➢ অন্ধনালিকা বা Diverticula: বৃহদন্ত্রের দেওয়ালে ফুলে ফুলে থাকে। তাতে দুর্বল রক্তনালী থাকে, যেগুলো হঠাৎ করে ফেটে অনেকটা রক্ত বেরিয়ে যেতে পারে। ব্যথা থাকে না।

ভগন্দর বা Anal Fistula: মলাশয় ও মলদ্বারের পাশের চামড়ার মধ্যে তৈরি হওয়া নালী ঘা

➢ কোলোন ক্যানসার (Colon cancer) বা মলাশয়ের ক্যানসার (Rectal cancer): প্রথম অবস্থায় এর একমাত্র উপসর্গ হতে পারে মলদ্বার দিয়ে রক্ত পড়া। প্রথম অবস্থায় ধরা পড়লে চিকিৎসা করাও সহজ। তাই মলদ্বার দিয়ে রক্ত পড়লে অবহেলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

মলদ্বার দিয়ে রক্ত পড়ার যে কারণগুলো কম দেখা যায়:

➢ তঞ্চনরোধক ওষুধ বা Anticoagulant drugs: অ্যাসপিরিন বা ওয়ারফারিনের মতো কিছু ওষুধ ব্যবহার করা হয় রক্ত জমাট বাঁধা ঠেকাতে। তা থেকে অন্যান্য জায়গার মতো মলাশয় থেকেও রক্ত পড়তে পারে।

➢ অন্ত্রের প্রদাহী রোগ বা Inflammatory bowel disease: ক্রোন'স ডিজিজ (Crohn's disease) বা আলসারেটিভ কোলাইটিস (ulcerative

শিশুদের মলদ্বার দিয়ে ব্যথাহীন রক্তপড়ার সবচেয়ে সাধারণ কারণ পলিপ।

colitis)—এই দীর্ঘকালীন রোগগুলোতে অন্ত্রের ভেতরকার আবরণীতে ঘা হয়। আলসারেটিভ কোলাইটিসে বৃহদ্‌ন্ত্রের নীচের অংশ ও মলাশয় প্রভাবিত হয়। ক্রোন'স ডিজিজ-এ প্রভাবিত হয় অন্ত্রের ওপরের অংশ। দুইয়েই রক্ত-মেশানো পাতলা পায়খানা হতে পারে।

➢ বৃন্তার্বুদ বা Polyp: বৃহদন্ত্র বা মলাশয়ের ভেতরের দেওয়ালে ফোলা। সাধারণত কোনো অসুবিধা হয় না। কখনো-সখনো মলের সঙ্গে রক্ত যেতে পারে। শিশুদের মলদ্বার দিয়ে ব্যথাহীন রক্তপড়ার সবচেয়ে সাধারণ কারণ পলিপ। রোগীকে অজ্ঞান করে পলিপের গোড়ায় সুতো বেঁধে কেটে বাদ দেওয়া হয়।

➢ যৌন রোগ বা Sexually transmitted infections: পায়ু দিয়ে কোনো যৌন-সংসর্গে সংক্রমণ ছড়াতে পারে, এবং রক্ত পড়তে পারে।

বুঝলেন তো মলদ্বার দিয়ে রক্ত পড়াকে অবহেলা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

সমাধান

✠	✠	✠	১ লু	✠	✠	২ র	৩ চা	✠	৪ হে	৫ পা
✠	৬ কা	দ	ম্বি	৭ নী	✠	✠	৮ প	রি	পা	ক
৯ তা	লা	✠	১০ নি	প	ল	✠	✠	✠	রি	✠
✠	জ্ব	✠	✠	✠	✠	১১ আ	য়ো	১২ ডি	ন	✠
১৩ পা	র	১৪ পি	উ	রা	✠	ই	✠	স্ক	✠	১৫ য
থ	✠	১৬ উ	ল	✠	১৭ সা	বু	✠	✠	১৮ ট	ব
র	✠	রি	✠	১৯ কে	✠	২০ প্রো	ল্যা	ক্টি	ন	✠
✠	২১ বো	ন	২২ টি	বি	✠	ফে	✠	✠	২৩ সি	২৪ পা
✠	✠	✠	২৫ টে	ন	২৬ শ	ন	✠	২৭ ভা	ল	ভ
✠	২৮ রে	টি	না	✠	ল্য	✠	২৯ তা	জা	✠	ল
৩০ কে	স	✠	৩১ স	র্দ্দি	✠	৩২ হা	মা	✠	৩৩ জি	ভ

রিপোর্ট

উত্তরবঙ্গের চা বাগানে মেডিক্যাল ক্যাম্প

সম্প্রতি চা বাগান সংগ্রাম সমিতি/লালি গুরাস ও শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের প্রচেষ্টায় উত্তরবঙ্গের কিছু চা বাগানে কয়েকটি মেডিক্যাল ক্যাম্প সংগঠিত হল। তার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট রাখছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**।

মার্চ, ২০১৬-র শেষ সপ্তাহে ও মে মাসের প্রথম সপ্তাহে শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ, সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতাল, চা বাগান সংগ্রাম সমিতি ও এনএপিএম-এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় মেডিক্যাল ক্যাম্প করা হয় হান্টাপাড়া, গেরগেন্ডা, ডুমচি এবং বান্দাপানী চা বাগানে।

মে মাসের শেষে শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের ডাক্তাররা চিকিৎসা শিবির চালালেন ছয়টি চা বাগানে—২৩ মে থেকে ২৮ মে। ২৩ মে দার্জিলিং জেলার সমতলে গঙ্গারাম চা বাগানে, ২৪ মে থেকে পাহাড়ের তিনধারিয়া, ২৫ মে মার্গারেট'স হোপ, ২৬ মে ধোতরে, ২৭ মে পেশক এবং জলপাইগুড়ি জেলার সমতলের চা বাগান বাগরাকোটে। ব্যবস্থাপনায় কোথাও ছিল চা বাগান সংগ্রাম সমিতি, কোথাও নেপালী সংস্কৃতি পত্রিকা *লালি গুরাস*।

ডুয়ার্সের চারটি চা বাগানে শিবিরে আমরা রোগীদের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের সমতলের চেয়ে অনেক বেশি হারে উচ্চ রক্তচাপের প্রাদুর্ভাব দেখেছি। এর কারণ অনুসন্ধান করা দরকার।

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের সংগঠকরা কার্ডিয়োলজিস্ট, কমিউনিটি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ প্রভৃতিদের নিয়ে একটি বিশদ সার্ভের পরিকল্পনা করছেন। দক্ষিণবঙ্গের সমতলের গ্রামীণ ও শহর এলাকা এবং উত্তরবঙ্গের সমতল ও পাহাড়ি এলাকায় উচ্চ রক্তচাপের প্রাদুর্ভাবের তুলনা, উচ্চ রক্তচাপের সঙ্গে এলাকার খাদ্যাভ্যাসের সম্পর্ক, অন্যান্য আর্থসামাজিক বিষয় নিয়ে অধ্যয়নই এই সার্ভের উদ্দেশ্য।

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের সংগঠকরা আরও ভাবছেন চা বাগানগুলির নবযুবক-যুবতীদের মধ্যে থেকে স্বাস্থ্যকর্মীদের এক বাহিনী গড়ে তোলার কথা। বিভিন্ন সাধারণ স্বাস্থ্যসমস্যা সামলানোর পাশাপাশি যাঁরা উচ্চ রক্তচাপের রোগ-নির্ণয় করতে পারবেন এবং উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দিতে পারবেন। পাহাড়ের চা বাগানের বাসিন্দাদের মুখে শোনা—

৬ দিনের শিবিরের শেষ কী তথ্য পেলাম দেখুন:

ক্রমাঙ্ক	তারিখ	চা বাগানের নাম	সমতল/পাহাড়	মোট রোগী	উচ্চ রক্তচাপের রোগী	উচ্চ রক্তচাপের রোগীর শতকরা হার
১	২৩ মে, ২০১৬	গঙ্গারাম	সমতল	১১৮	৯	৭.৬%
২	২৪ মে, ২০১৬	তিনধারিয়া	পাহাড়	৪০	১২	৩০%
৩	২৫ মে, ২০১৬	মার্গারেট'স হোপ	পাহাড়	৩৯	১৯	৪৮.৭১%
৪	২৬ মে, ২০১৬	ধোতরে	পাহাড়	১১২	৪২	৩৭.৫%
৫	২৭ মে, ২০১৬	পেশক	পাহাড়	১০৩	৪৭	৪৫.৬৩%
৬	২৮ মে, ২০১৬	বাগরাকোট	সমতল	১৫৯	৩৭	২৩.২৭%

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের পক্ষে চিকিৎসক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে হান্টাপাড়া, গেরগেন্ডা, ডুমচি এবং বান্দাপানী—ডুয়ার্সের এই চারটি চা বাগানে শিবিরে আমরা রোগীদের মধ্যে যে হারে উচ্চরক্তচাপের প্রাদুর্ভাব দেখেছি, তা দক্ষিণবঙ্গের সমতলের চেয়ে অনেকটাই বেশি। তাই এবারের শিবিরের আগে থেকেই ঠিক করা ছিল যে ২৫ বছরের বেশি বয়সি সমস্ত রোগীরই আমরা রক্তচাপ মাপব এবং নথিভুক্ত করব।

> ডুয়ার্সের এই চারটি চা বাগানে শিবিরে আমরা রোগীদের মধ্যে যে হারে উচ্চরক্তচাপের প্রাদুর্ভাব দেখেছি, তা দক্ষিণবঙ্গের সমতলের চেয়ে অনেকটাই বেশি।

তালিকায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পাহাড়ি এলাকায় শিবিরে দেখা রোগীদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেশি।

> তাঁদের মৃত্যুর সর্বাধিক কারণগুলির মধ্যে আছে সেরিব্রাল স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক।

তাঁদের মৃত্যুর সর্বাধিক কারণগুলির মধ্যে আছে সেরিব্রাল স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক ইত্যাদি। উচ্চ রক্তচাপ থাকলে এই সব রোগেরই সম্ভাবনা বাড়ে। তাই উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে অনেকগুলি অকালমৃত্যুই রোধ করা যাবে। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকার সম্পাদক

আর্সেনিক অথবা মৃত্যুর ছিন্ন দিনলিপি

আর্সেনিক নিয়ে নাগরিক সমাজের তেমন মাথাব্যথা নেই, যদিও ধীরে ধীরে গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষগুলোকে ছিবড়ে করে আর্সেনিক উঠে আসছে শহর-নগরেও। তবু পত্রপত্রিকায় আর্সেনিক নিয়ে নেই নেই করে অনেক লেখাই ছাপা হয়েছে। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র একটা সংখ্যা হয়েছে আর্সেনিক প্রদূষণ নিয়ে। এবার এক পর্যটকের ক্যামেরা ও কলমে কিছু ব্যক্তিগত চিত্রমালা (নাম পরিবর্তিত)—লিখছেন **দিলীপ ব্যানার্জী**।

নদিয়া, মহেশচন্দনপুর গ্রাম ২৭-০৪-২০১৬

গীতা সরকার : মাঝবয়েসি গৃহবধূ, সকাল বিকেল বাড়ি থেকে এক-শো মিটার দূরে টিউবওয়েল থেকে খাওয়ার জল নেওয়া নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। ভালোই লাগত একঘেয়ে কাজের মধ্যে কলতলায় এলে, গ্রামের আর দশটা বউ-মেয়ের সঙ্গে আড্ডা আর জল নিয়ে ফিরে যাওয়া।

গাছের ছাওয়ায় টিউবওয়েলটা থাকায় কুলকুলে ঠান্ডা জলে গ্রামের সবাই পরিতৃপ্ত।

কলে ভিড় জমার আগে সকালের জলটা আনায় অভ্যস্ত গীতা, আজকের সকালটা এক পশলা বৃষ্টির পর বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা, বালতি দুলিয়ে গীতা কলের গোড়ায়।

ওমা এ কী কান্ড কলের মাথায় রেড ক্রশ, এ তো দেখছি আলিবাবার গল্পের মতো, গীতা ইতিমধ্যে কানাঘুসোয় শুনেছে যে আর্সেনিক দূষণযুক্ত জল পান করলে চর্ম রোগ, পেটের অসুখ, জ্বর, পরিশেষে ক্যানসারে মৃত্যু; লাল দাগ তারই সতর্কবার্তা। গত দশ বছরেরও বেশি এই স্বল্প গভীর টিউওয়েল থেকে বাড়ির সবাই এই কলের জল খেয়ে আসছে, ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতর যেন ঠান্ডা হয়ে আসে। এবার উপায়?

চিত্র ১. গীতা সরকার (নাম পরিবর্তিত) ও আর্সেনিক যুক্ত নলকূপ

নিরাপদ মণ্ডল, বয়স ৬০ বছর, ঘেঁটুগাছি, নদিয়া।

তখন নিরাপদ ৩০ বছরের তরতাজা যুবক, খাটনিতে অগ্রণী, সংগঠনে নেতা, ব্যবসায়ী বিচক্ষণ।

চিত্র ২. নিরাপদ মণ্ডলের (নাম পরিবর্তিত) পানীয় জলের আর্সেনিকের রিপোর্ট

১৯৮৯ সালে নদিয়া জেলার নাগরিকদের ধারণার বাইরে ছিল কীভাবে আর্সেনিক পয়জন কামড় বসিয়েছে মহামারির মতো জেলার অধিকাংশ গ্রামগুলোতে।

অপর্যাপ্ত সারফেস ওয়াটারের অভাব, কেননা নদী, খাল, বিল, পুকুর ওয়াটার বডি বা ভেসটেড ল্যান্ড সংস্কার করা হয় না; এছাড়া বিল্ডার্সদের হাতে জমি তুলে দেওয়ার ফলে এতদিনে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সবকটা জেলাই আর্সেনিকের কবলে। ৭০-এর দশকে সবুজ বিপ্লবের জোয়ারে অবাধে ওয়াটার লিফটিং এবং স্বল্প গভীর নলকূপের অবাধ ব্যবহারে আর্সেনিকের সংক্রমণ। তরতাজা যুবক নিরাপদ নেমে পড়ল একদল শুভানুধ্যায়ী চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক ও সাথীদের নিয়ে। সংস্থার নাম হল আর্সেনিক প্রতিরোধ কমিটি। শুরু হল নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে রাত দিনের কাজ—রক্ত, মল, মুত্র আর পানীয় জলের গুণাগুণ পরীক্ষা।

সমীক্ষায় জানা গেল একমাত্র ঘেঁটুগাছি গ্রামে গত ১০-১২ বছরের মধ্যে ৪২ জনের মৃত্যু আর্সেনিকজনিত বিষক্রিয়ায়। ভয়ংকর! গত কয়েক দিন নিরাপদর দেখা নেই কমিটির কাজে, খোঁজ নিয়ে জানা গেল জ্বরে আক্রান্ত, সঙ্গে ডিসেন্ট্রি। চিন্তার কথা, কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করে চিকিৎসা আর তার সঙ্গে প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু। জানা গেল পানীয় জল-জনিত ইনফেকশন থেকে এই বিপত্তি। আরও ধরা পড়ল জলে আর্সেনিক নামক বিষের সন্ধান।

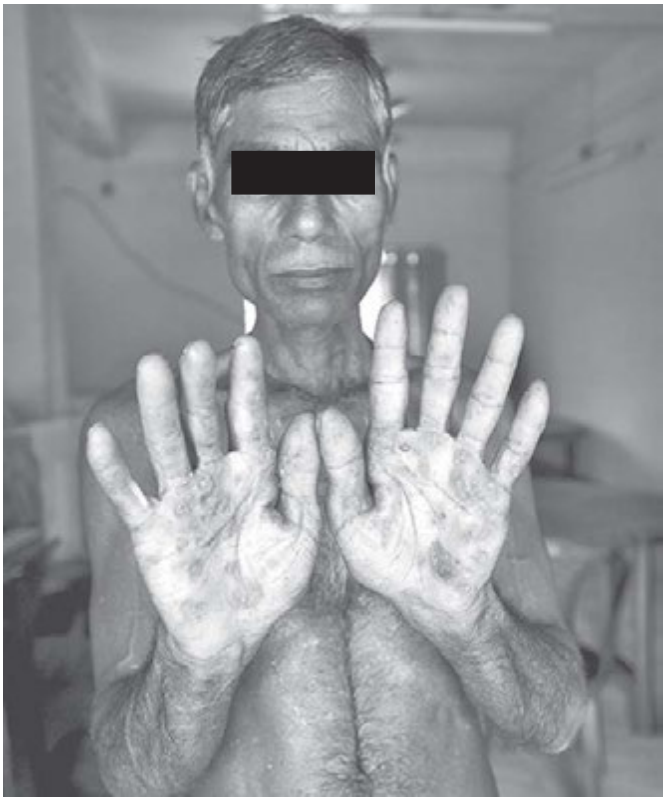

চিত্র ৩. আর্সেনিকের ছোপ হাতে ও সারা দেহে

চিত্র ৪. অনিল সরকার (নাম পরিবর্তিত) বুকে চামড়ার ক্যানসার

সারা পশ্চিমবঙ্গে মূলত গ্রাম আর শহরতলির গরিব ও নিম্নমধ্যবিত্তরা আর্থিক অনটনের জন্য স্বল্প গভীর নলকূপ দিয়ে বাসন মাজা, পানীয় জল, সেচের কাজ সবই করেন।

ক্রমশ আরও পরীক্ষানিরীক্ষায় প্রমাণিত সব রকম ফসল আর্সেনিক-প্রদূষিত। এছাড়া স্বল্প গভীর নলকূপের জল ব্যবহারকারীরা চর্ম রোগ, পেটের অসুখ ও লাং-ক্যান্সার, লিভার ক্যান্সার এবং স্কিন ক্যান্সারের মতো ভয়ংকর রোগের শিকার।

নিরাপদ আজ বছর ষাটেকের, গায়ের চামড়া পাতলা, এছাড়া সারা গায়ে ছাপ ছাপ দাগ (মেলানোসিস) দুর্বল, মাঝে মধ্যে জ্বরে আক্রান্ত।

স্বল্প গভীর নলকূপের জল ব্যবহারকারীরা চর্ম রোগ, পেটের অসুখ ও লাং-ক্যান্সার, লিভার ক্যান্সার এবং স্কিন ক্যান্সারের মতো ভয়ংকর রোগের শিকার।

বলে রাখা দরকার, রাজনৈতিক চাপে আর্সেনিক প্রতিরোধ কমিটিকে গুটিয়ে নিতে হয়; নেতাদের মতে অকারণে প্যানিক করার কোনো কারণ নেই।

অনিল সরকার, বয়স ৫২ ঘেঁটুগাছি, নদিয়া ৩১-০৫-২০১৬

আমরা অনিলের অপেক্ষায় বসে গ্রামের সমবায় সমিতির অফিসে, কথায় কথায় ৪০/৪২ জনের মৃত্যু, একটা গ্রাম প্রায় উজাড় করার গল্প—আমরা আতঙ্কিত ঘটনার বিবরণে।

এরই মধ্যে একজন ধোপদুরস্ত যুবক ঘর্মাক্ত অবস্থায় উপস্থিত, প্রচণ্ড গরম এবং আর্দ্রতা। আলাপ হল সঙ্গে সঙ্গেই; গ্রামের সমবায় সমিতির ব্যাঙ্কে কাজ করে, ক্লিয়ারিং-এর কাজ তাই দৌড়দৌড়ির কাজ। বলল, আমার সময় খুব কম যদি একটু তাড়াতাড়ি করেন। বললাম, আপনি বলুন আপনার পরিবারের কথা আপনার কথা।

''জানেন এক সময় সারা পাড়াটা জুড়ে আমরা ছিলাম, তার নাম সরকারপাড়া, আমার নাম অনিল সরকার, আমি অন্যত্র উঠে এসেছি। একে একে আমার পরিবারের সবাই আর্সেনিকের শিকার, আমার বাবা, কাকা, কাকিমা এক এক করে আটজনের মৃত্যু ভাবতে পারেন . . .'' বলতে বলতে প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়ে সুনীল, ''আমাকেও কামড় বসিয়েছে, বুকের ওপর একটা ক্ষত নিয়ে, তবে আমি এখন ভালো আছি, পাঁচ বছর হোমিওপ্যাথি চলেছে, কিছুতেই সারছিল না, অ্যালোপ্যাথি দেখাতে একটু বেটার, ডাক্তার বলেছে অপারেশন করে নিতে, আমি করব না ঠিক করেছি, আমাদের কাকা জ্যাঠারা অপারেশন করে ঘা ছড়িয়ে মারা গেছে।''

বললাম, ''একটু জামাটা খুলবেন ছবি তুলব''। বলল, ''না এখানে না, বাড়ি চলুন, খুব কাছেই বাড়ি''। জামাটা খোলার পর দেখা গেলো ঠিক বুকের ওপর মাংসটা কেউ ঠুকরে খেয়েছে। কারসিনোমা। মনটা খারাপ হয়ে গেল, বাড়িতে বউ, বাচ্চা, নতুন বাড়ি, স্বপ্ন তো ছুঁয়ে এনেছে, তবে! স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক সাংবাদিক।

তিনি বৃদ্ধ হলেন . . .

ফুলে ফলে ভরা শস্যশ্যামলা এই পৃথিবী, সত্তর বছরের সমস্ত স্মৃতি, সম্পর্ক ও মায়া ত্যাগ করে যাওয়া খুব কঠিন তবু, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা হলেন না সুমন্তবাবু। তিনি মনে মনে পরিকল্পনা করেই রেখেছেন আজ রবীন্দ্রসরোবরের মেট্রো স্টেশনে গিয়ে দুপুরেব২ দিকে কাজটা সারবেন। এই জীবন আর রাখতে চান না তিনি। স্ত্রী গত হয়েছেন বছর পাঁচেক আগেই। ছেলে বউমা-র সংসারে বোঝা হয়ে থাকতে আর ভালো লাগছে না তাঁর। হ্যাঁ, এমনটা আমরা খবরের কাগজ খুললে প্রায়ই দেখতে পাই। সুমন্তবাবু-রা সমস্ত জীবন কাটিয়ে এমন নির্মম সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন জীবনের উপান্তে এসে। এই সংবাদ কিন্তু কোথাও গিয়ে সমাজের ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের ছাপ তুলে ধরে আমাদের সামনে। তাই কাটাছেঁড়া করে দেখে নেওয়ার দরকার আছে বৃদ্ধ বয়সের সমস্যাগুলি কী এবং তার সমাধান বা প্রতিকার কীভাবে করা সম্ভব। সুশীল সমাজ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয় নিয়ে এবারে নিবন্ধ লিখেছেন **রুমঝুম ভট্টাচার্য।**

ভারতবর্ষ বৃদ্ধ হচ্ছে! মতামতটা ব্যক্তিগত নয়। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের জন্য এক সমীক্ষার রিপোর্টে এমনটাই জানিয়েছেন হেল্প এজ ইন্ডিয়া। সেই সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের দেশে মোট বয়স্ক মানুষের সংখ্যা সাত কোটি সত্তর লক্ষ (৭৭ মিলিয়ন) এবং আগামী পঁচিশ বছরে সেই সংখ্যা দাঁড়াবে সতেরো কোটি সত্তর লাখ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই বিরাট সংখ্যক বয়স্ক মানুষদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা রক্ষার জন্য যে পরিকাঠামো ও পরিষেবার প্রয়োজন আছে তার জন্য আমাদের দেশ কি প্রস্তুত?

আজও আমাদের দেশে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' অধরাই রয়ে গেছে। সেই প্রেক্ষিতে বলাই বাহুল্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা অবহেলিত আছেন ও থাকবেনও। এককালে ভারতবর্ষের মূল্যবোধ ও একান্নবর্তী পারিবারিক গঠনের দৌলতে বয়স্কদের সম্মান সমাজে অটুট থাকত। কিন্তু আজ দিন বদলেছে। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে তৈরি হয়েছে ছোটো ছোটো পরিবার। বাড়ির মহিলারাও পুরুষদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাইরের কাজ করছেন। ফলে বয়স্কদের দেখাশোনার ভার গিয়ে পড়ছে হয় পয়সা দিয়ে রাখা আয়ার ওপর বা বৃদ্ধাশ্রমের ওপর। নিরাপত্তার অভাব, সামাজিক ও মানসিক একাকীত্ব, এসব কারণে তাদের সুরক্ষা বিঘ্নিত। কখনো তারা নিজেরাই মৃত্যুকে বেছে নিচ্ছেন, কখনো বা দুষ্কৃতিদের হাতে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করছেন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়ানো মানুষগুলো হঠাৎ করেই নিজের পরিবারে বা সমাজে যেন বোঝা হয়ে যান। এর জন্য শুধুই কি দায়ী পরিবার বা সমাজ? ব্যক্তির নিজস্ব দায়িত্ব এক্ষেত্রে কতটা?

কীভাবেই বা বৃদ্ধ বয়সের উপযুক্ত করে নিজেদের গড়ে তোলা যেতে পারে? কারণ জীবনচক্রের নিয়ম লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। কাজেই মধ্য বয়সে পৌঁছানো প্রতিটি মানুষের উচিত অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে বয়স্ক মানুষদের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং তার প্রতিকার ও প্রতিরোধ সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তোলা।

বয়স্কদের সমস্যা

১. স্বাস্থ্য

কথাতেই বলা হয় 'We start dying the day we are born'। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের অবনতি একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু কারও কারও ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি হতে থাকে। ফলে তার অন্যের ওপর নির্ভরতা অনেকাংশে বেড়ে যায়। এই নির্ভরতার পরিমাণ কতটা তার ওপর নির্ভর করে বয়স্ক মানুষটির সামাজিক মূল্যায়ন ও স্ব-মূল্যায়নও বটে। তাই যদি সময় থাকতে একটু সচেতন হওয়া যায় এবং নিজের শরীরের যত্ন নেওয়া যায় তাহলে অনেকক্ষেত্রে বেশ ভালো ফল পাওয়া যায়। আমাদের দেশে বিশেষ করে মেয়েরা নিজেদের শরীরের যত্ন নিতে একেবারেই অভ্যস্ত নন। সংসারে সব থেকে নিম্ন মানের খাবারটা তাঁর জন্য বরাদ্দ। আজকের আধুনিক মেয়েদের মধ্যেও অনেকে ঘরে বাইরে কাজ করা সত্ত্বেও নিজেদের খাদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে একেবারেই সচেতন নন। কিন্তু দিন পালটাচ্ছে। তাঁদের বুঝতে হবে অতিরিক্ত পরিশ্রমের মধ্যেও সুস্থ থাকতে গেলে সুষম খাবার বিশেষ প্রয়োজন। তাই কাজের তাড়ায় সবার সব প্রয়োজন মেটানোর পর তাঁদের প্রয়োজন না মিটলেও ক্ষতি নেই—এই মনোভাব বদলাতে হবে। মধ্যবয়স থেকেই স্বাস্থ্যকর খাবার, নিয়মিত ব্যায়াম ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থাকলে বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক কারণে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হবার প্রয়োজনীয়তা কমবে যা বয়স্ক মানুষের ভালো থাকার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। আর সরকারি তরফ থেকে প্রয়োজন সবার জন্য স্বাস্থ্য রক্ষার খাতিরে সুলভে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থাপনা।

২. অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা

অর্থই হল সব অনর্থের মূল। এবং কূটাভাসটি হল এই যে অর্থই আবার জগতের চালিকা শক্তি, 'Money is the petrol of life'। কাজেই পেট্রোলের অভাব ঘটলে যেমন গাড়ির প্রয়োজনীয়তা ফুরায় তেমন অর্থশক্তির জোর না থাকলে বয়স্ক মানুষ পরিত্যক্ত হয় স্বজনের কাছে। তাই ভালো থাকতে চাইলে বয়স্কদের সাধ্যমতো উপার্জন ক্ষমতা থাকা দরকার। যদি শারীরিক কারণে তাঁরা অক্ষম হয়ে পড়েন তবে সরকারি তরফ থেকে তাঁদের দায়িত্ব নেওয়া আবশ্যক, যাতে তাঁরা পরিবারের মানুষজনের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে না পড়েন।

আগেকার পারিবারিক গঠন ও মূল্যবোধ বদলেছে। এখন মানুষের মূল্যায়ন অনেকটাই পার্থিব বিষয়ভিত্তিক। তাই যে গোরু দুধ দেয় না তাকে এককালে দুধ দিয়েছিল বলে খাবার দিয়ে পোষার মানসিকতা আজ অনেকটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই বয়স থাকতে ভবিষ্যতের জন্য কিছুটা ব্যবস্থা রাখা এবং উপার্জনক্ষমতা বজায় রাখাও বৃদ্ধ বয়সে ভালো থাকার জন্য প্রয়োজন।

৩. একাকীত্ব

পরিবারে সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। বয়স্ক মানুষটি একাকীত্বে ভুগছেন এমনটা হামেশাই শোনা যায়। প্রথমত নিজের ভালো লাগাগুলোকে আবিষ্কার করার একটা সময় এই বৃদ্ধ বয়স। কর্মক্ষেত্র থেকে ছুটি পেয়ে এই সময়ে ব্যস্ত থাকা দরকার গঠনমূলক কাজে। পরিবারে মানুষজনকে সাহায্য করা, সমাজের গঠনমূলক কাজকর্মে নিজেকে ব্যস্ত রাখার অভ্যাস করতে হবে। শিক্ষিত মানুষেরা দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় সাহায্য করতে পারেন। এতে সময় ভালোভাবে কাটবে। নিজেকে প্রয়োজনীয় করে তোলার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে।

মহিলাদের সমস্যাটা এ ব্যাপারে একটু ভিন্ন। যাঁরা সংসারে ঘরের সমস্ত বিষয়ে কর্ত্রী ছিলেন হঠাৎ করে পুত্রবধূ আসায় তাঁর সেই জায়গাটা (position) একটু সরে যায়। ফলত মহিলারা মানসিকভাবে হীনম্মন্যতায় ভুগতে থাকেন ও জোর করে তাঁর অবস্থান আঁকড়ে ধরতে চান। কাজেই পুত্রবধূর সঙ্গে সংঘাত উপস্থিত হয়। এই সমস্যার প্রতিকার হল পূর্বে শাস্ত্রে উল্লেখিত বানপ্রস্থ। এখন এর রূপ অবশ্য আলাদা—সংসারে থেকে পরিবারের সব বিষয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখাই যায় কিন্তু সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রগুলি থেকে নিজেকে সরিয়ে আনা প্রয়োজন। এতে একাকীত্বের বোধ আসবে না আবার সম্ভাব্য সংঘাতও এড়িয়ে চলা যাবে। বলা যতটা সহজ করাটা কিন্তু তত সহজ নাও হতে পারে।

৪. নেতিবাচক মনোভাব

একজন মানুষ এক সময়ে যিনি শারীরিকভাবে শক্তসমর্থ ছিলেন, সংসারে যার প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রমাগত এগুলো হারাতে থাকলে তীব্র হীনম্মন্যতা এসে তাঁকে গ্রাস করে। অনেকক্ষেত্রে তাঁর মনে হয় তাঁকে অবহেলা করা হচ্ছে। পরিস্থিতিগুলি মূল্যায়ন করার সময় তাতে নেতিবাচক মনোভাব যুক্ত হয়। ফলে মনে তৈরি হয় বিষাদ, রাগ, উদ্বেগ (যেগুলি কিনা নেতিবাচক আবেগ)। এই নেতিবাচক মনোভাব বয়স্কদের মধ্যে তৈরি করে মানসিক চাপ। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় এই নেতিবাচক মনোভাবের কারণে তাঁরা আত্মহননের পথ বেছে নেন। কেন এই নেতিবাচকতা (Negativity) গ্রাস করে বয়স্কদের? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ জীবনের পরিস্থিতিগুলোকে নিজের মনের মতো সাজিয়েগুছিয়ে পেতে চায়। অথচ যখন তেমনটা হয় না তখন অনেক অভিযোগ জমা হয় মনের ভিতর। কিন্তু যুক্তি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে সেই প্রতিকূল পরিস্থিতির দায়ভার অনেকটাই হয়তো ব্যক্তির নিজের সৃষ্টি করা। ধরুন একজন মানুষ বয়সকালে নিজের বৃদ্ধ বাবা-মাকে ত্যাগ করেছেন নিজের সন্তান ও পরিবারের সুখের জন্য অথচ তার বৃদ্ধ বয়সে তাঁর ছেলে যখন একই আচরণ করল তাঁর সঙ্গে তখন তিনি বুঝে পান না কী পাপের ফল তাঁকে ভোগ করতে হচ্ছে। তাই একথা মাথায় রাখতে হবে সন্তানের মধ্যে সেই মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার দায়িত্বও কিন্তু বাবা-মা-রই। আর তা শুধু মুখের কথায় হওয়া সম্ভব নয়। উপযুক্ত রোল মডেল হিসাবে বাবা-মা-র ভূমিকাও অনেকটা। অবক্ষয়ী সমাজের দায়ভার তরুণদের কাঁধে শুধু না চাপিয়ে নিজেদের আচার-আচরণের পোস্টমর্টেমও জরুরি।

পরিবারের মানুষজনের কাছে কেবল অভিযোগ করতে থাকলে দূরত্ব ক্রমাগত বাড়তে থাকে। তাই নেতিবাচক মনোভাবকে কাটিয়ে উঠতে অবসর সময়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখা প্রয়োজন ও সন্তান বা সন্তানতুল্য মানুষগুলির সুবিধা-অসুবিধাগুলিকে মেনে নিতে পারলে অনেক সময়েই শান্তিপূর্ণভাবে সংসারে বাস করা সম্ভব।

উপরিউক্ত সমস্যাগুলি অতিক্রম করতে না পারলে অনেকক্ষেত্রেই প্রবীণদের মানসিক বা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। অশক্ত শরীর, দুর্বল স্মৃতিশক্তি, উদ্বেগ ইত্যাদির কারণে শুধু পরিবারে নয়, সমাজেও তাদের অনেক অপদস্থ হতে হয়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে মারধর করা, বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া এসব ঘটনা কিন্তু আমাদের আশেপাশেই ক্রমাগত ঘটে চলেছে। শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত পরিবারেও এমন ঘটনা কিন্তু বিরল নয়। প্রশ্ন হল এমন অমানবিক আচরণের মূলগত কারণ কী? প্রধানত অসহিষ্ণুতাই এর জন্য দায়ী।

বয়স্কদের প্রতি এই মনোভাবের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। ব্যাঙ্কে, পোস্ট অফিসে বয়স্কদের অপমানিত হতে দেখলে মনে হয় যে মানুষটি ওই চাকরিটি করছেন তিনি কি সত্যিই ওই চাকরির উপযুক্ত? পেনশন অ্যাকাউন্ট যিনি তদারকি করেন তাঁর তো অনেক বেশি সহনশীল হওয়া দরকার, কারণ তাঁর ক্লায়েন্ট যাঁরা হবেন তাঁরা প্রবীণ এটা স্বতঃসিদ্ধ, অথচ সরকারি চাকরি করেন যিনি তিনি ভুলে যান মানুষকে পরিষেবা দেওয়াই তাঁর কাজ এবং সেজন্য সরকার তাঁকে যে মাইনে দেন সেটাও জনগণেরই অবদান। এরকমটা ঘটে বা ঘটছে কারণ পরিবারেও দেখা যাবে ওই মানুষটি তাঁর বৃদ্ধ বাবা-মাকে উপযুক্ত সম্মান দেখাতে পারছেন না। কাজেই যেটা আলোচ্য সেটা হল মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ও সরকারি উদ্যোগ এই সমস্যার সমাধানে বিশেষ উপযোগী।

পরিশেষে যেটা উল্লেখ্য তা হল প্রবীণদের অভিজ্ঞতা সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তাই তাঁদের অপ্রয়োজনীয় মনে করাটা মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়। বয়সজনিত সমস্যাগুলিকে মানিয়ে নিয়ে তাঁদের মূলস্রোতে টিকিয়ে রাখতে পারলে নবীন প্রজন্মের বিকাশে এক সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

লেখক মনোবিদ, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

গ্লকোমা সম্বন্ধে দু-একটা কথা যা আমি জানি

ডা. সোহম সরকার

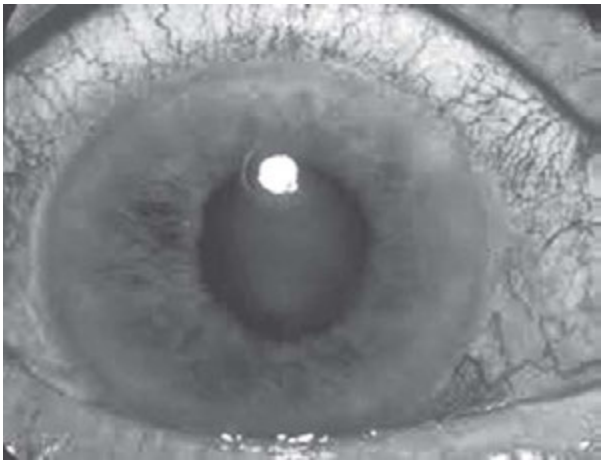

ঘটনা-১

বছর ৪৫-এর ব্যস্ত মানুষ শান্তনু মণ্ডল গেছেন চোখের ডাক্তারের কাছে একটু চশমার পাওয়ার অ্যাডজাস্ট করাতে। বয়স বাড়লে তো পাওয়ারও বাড়ে। বিনামেঘে বজ্রপাত—ডাক্তার দেখে বললেন গ্লকোমা আছে—টেস্ট করতে হবে কয়েকটা, হয়তো সারাজীবন চোখে ড্রপ দিতে হবে, নইলে অন্ধত্ব অনিবার্য।

ঘটনা-২

গার্লস স্কুলের রিটায়ার্ড দিদিমনি অপর্ণ বাগ সারাজীবন বড়ো কোনো অসুখ ছাড়াই দিব্যি ছিলেন। চশমার একটু হাই-পাওয়ার বরাবরই ছিল—বড়ো সমস্যা হয়নি কখনো। ছেলে, ছেলের বউ-এর সঙ্গে গেছিলেন 'প্রাক্তন' দেখতে—সিনেমার হলেই মাথা ও ডান চোখ ব্যথা শুরু হল—প্রথমে আমল দেননি, রাতে ব্যথা আরও বাড়ল, তীব্র ব্যথা, চোখ লাল, সঙ্গে আংশিক অন্ধত্ব—সকালে ডাক্তার ক্লিনিকে জানালেন গ্লকোমার অ্যাকিউট অ্যাটাক—লেসার করে শেষে চোখ বাঁচানো গেল।

ঘটনা-৩

৬৭ বছরের আশিয়া খাতুন। গ্লকোমা বা 'শিরা শুকিয়ে' যাবার অসুখ ধরেছে বছর তিনেক আগেই। সরকারি হাসপাতালে গেছিলেন—ডাক্তাররা বলেছিল চোখে ড্রপ দেবেন, লিখে দিয়েছিল একটা—তবে তার দাম অনেক। প্রথম দু-তিন মাস দিয়েছিলেন, তারপর যথারীতি বন্ধ। আজকাল আর চোখে কিছুই প্রায় দেখেন না—এবার ডাক্তার বলল যখন ড্রপ দিতে পারছেন না, অপারেশন করিয়ে নিন, অন্তত যেটুকু দেখছেন সেটুকু দৃষ্টি থাকবে।

গ্লকোমা কী? কার হয়?

গ্লকোমা হল বিশ্বময় অন্ধত্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কারণ (প্রথমটা হল ছানি)। সমগ্র বিশ্বে প্রায় ৫-৬ কোটি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। এতে সাধারণত চোখের ভেতরের প্রেশার বেশি থাকে। দৃষ্টিহীনতা আসতে থাকে এবং চোখের নার্ভ (অপটিক নার্ভ) খারাপ হতে থাকে। এ রোগ আমার আপনার, জাতি-ধর্ম-বাসস্থান-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবারই হতে পারে, এমনকী সদ্যোজাত শিশুরও থাকতে পারে।

কীভাবে হয়?

সাধারণত চোখের প্রেশার বেড়ে হয় (নরম্যাল-10-20mm of Hg)। কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ করা গেছে 20mm-এর নীচেও গ্লকোমার লক্ষণ পাওয়া যায়—একে নরমোটেনসিভ (স্বাভাবিক চাপ) গ্লকোমা বলে। তবে এদেরও প্রেশার সাধারণত বেশির দিকেই থাকে (যেমন 17-18mm of Hg)।

প্রশ্ন হল চোখের প্রেশার বাড়বে কেন? চোখের সামনের দিকের জায়গা, মণির পিছনে, যা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই----সেই অ্যান্টেরিয়র চেম্বারে (সামনের কক্ষ)-এ থাকে অ্যাকোয়াস হিউমর (Aquous Humor) নামে এক স্বচ্ছ তরল। এটা চোখে তৈরি হয় আবার অ্যান্টেরিয়র চেম্বারের কোণে 'ট্র্যাবেকুলার মেশ' নামক জালিকা দিয়ে বেরিয়েও যায়।

এখন যদি ওই জালিকা জ্যাম হয়ে যায় (যেমন অনেক সময় আমাদের আমাদের ধোয়ার বেসিনের নলের মুলে হয়) তবে অ্যাকোয়াস বেরোতে পারবে না—প্রেশার বাড়বে। এমনটা হয় ওপেন অ্যাঙ্গেল (Open Angle) গ্লকোমাতে। এটাই সব থেকে সাধারণ

কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ করা গেছে 20mm-এর নীচেও গ্লকোমার লক্ষণ পাওয়া যায়

কারণ। অনেক সময় আইরিশ-এর গঠন এমন দাঁড়ায় যে সেটা অ্যাকোয়াস-কে মেশ বা জালিকাতে যেতেই দেয় না—এটা হল ক্লোজড অ্যাঙ্গেল (Closed Angle) গ্লকোমার কারণ।

এছাড়া আরও অনেক কারণে গ্লকোমা হতে পারে, যেমন—আঘাত, টিউমার, চোখের অন্য অসুখ (যেমন আইরাইটিস), চোখের অপারেশন-এর পর ইত্যাদি। চোখের কিছু জন্মগত ত্রুটিপূর্ণ গঠনের জন্যও হতে পারে—তাতে জন্মের পরে পরেই অথবা কিছু বছর পরেও রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

কীভাবে বুঝব?

এটাই গ্লকোমার সবথেকে বিপজ্জনক দিক। সব থেকে বেশি দেখা যায় যেটা সেই ওপেন অ্যাঙ্গেলে (Open Angle) তেমন কোনো নির্দিষ্ট উপসর্গ থাকে না। রোগ কিছুটা এগোলে চোখে ব্যথা, রামধনুর মতো রং দেখা এবং দৃষ্টিসীমার পাশের দিক দেখতে অসুবিধা হতে পারে।

স্বাভাবিক চোখে সোজা তাকালে আমরা ১৮০ ডিগ্রি ফিল্ড দেখতে পাই—মাঝখানটি সবথেকে স্পষ্ট। গ্লকোমাতে দৃষ্টিহীনতা শুরু হয় আশপাশ থেকে—শেষে একটা কেন্দ্রের খানিক অংশতেই কেবল দৃষ্টিশক্তি বজায় থাকে। বিনা চিকিৎসাতে সেটাও একদিন থাকবে না। যেহেতু পাশের দিক থেকে ধীরে ধীরে শুরু হয়—প্রথম পর্যায়ে 'দৃষ্টি এড়িয়ে' যাবার হাই চান্স।

Angle Closure-এ (অর্থাৎ 'মেশ' বা জালিকার মুখ আচমকা বন্ধ) অবশ্য তীব্র ব্যথার কারণে প্রাথমিক অবহেলার চান্স কম; তবে এক্ষেত্রে ক্ষতিটা কয়েক ঘণ্টাতেই হয়, কয়েক মাস বা কয়েক বছর লাগে না।

কী করব?

ডাক্তারের কাছে যাব এবং রোগটা সম্বন্ধে জানব।

চিকিৎসা কী?

ডায়াগোনসিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপসর্গ নথিভুক্ত করতে হবে। চোখের প্রেশার দেখতে হবে। চোখের নার্ভ (দরকার মতো নেত্ররন্ধ্র বড়ো করে) পরীক্ষা করতে হবে। সন্দেহ হলেই ফিল্ড টেস্ট (HUF) করতে হবে। এতেই যথেষ্ট সূত্র পাওয়া যায়। সুযোগ থাকলে OCT/HRT-এর মতো অত্যাধুনিক ইমেজিং টেকনিক-এর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

রোগ নির্ণয় এবং পরিমাপ করার পর প্রত্যেকের জন্য আলাদা চিকিৎসার কায়দা নিতে হয়। করার মতো জিনিস হাতে একটাই—চোখের প্রেশার কমানো। কী ওষুধ (বা একাধিক ওষুধ) ভালো হবে, কী ডোজ হবে, নাকি সার্জারি দরকার সেটা ঠিক করতে হয় রোগীর সঙ্গে কথা বলে।

যে ওষুধগুলো আছে—

1. প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন জাতীয় ওষুধ—সবচেয়ে জোরালো, এখন এটাই প্রথম পছন্দের ওষুধ, তবে দামি।

তবে গ্লকোমা ধরা পড়ার আগেই যে পরিমাণ নার্ভ (এবং তার ফলে দৃষ্টি) ক্ষতিগ্রস্ত আছে তা ফেরানো যায় না।

2. কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ ইনহিবিটর—যথেষ্ট জোরালো, দামি।
3. বিটা ব্লকার—কম জোরালো, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেশি।
4. আলফা অ্যাগোনিস্ট।
5. মায়োটিক এজেন্ট।

ওপরের ওষুধগুলো সবই চোখের ড্রপ। তবে মুখে খাবার অ্যাসিটাজোলামাইড বা শিরায় ইঞ্জেকশন দেবার ম্যানিটলও অনেক সময় ব্যবহার করা হয়।

তবে মনে রাখতে হবে অ্যাঙ্গেল ক্লোজার গ্লকোমাতে LASER PERIPHERAL IRIDOTOMY যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই ভালো।

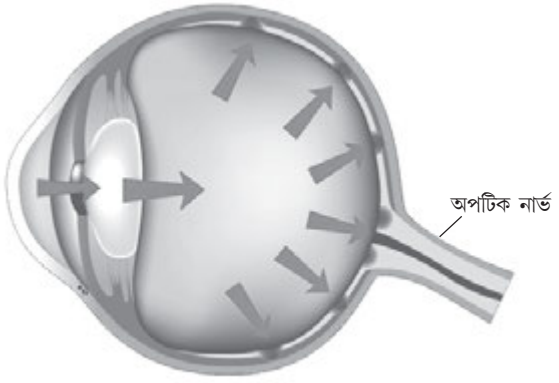

চিত্র ১. গ্লকোমায় বেড়ে যাওয়া অ্যাকোয়াস হিউমারের 'চাপ' চোখের ভেতরে অপটিক নার্ভের ক্ষতি করে

ওষুধ সর্বোচ্চ মাত্রাতে ব্যবহার করার পরও নার্ভের ক্ষতি চলতেই থাকলে রোগী ঠিকমতো ওষুধ না খেলে, বা অপারেশন করে সারানো যায় এমন কারণ থাকলে, অপারেশন করে নেওয়াই ভালো।

মনে রাখা ভালো যে গ্লকোমা সারানো যায় না। উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিসের মতো নিয়ন্ত্রণ করা যায়, আর ঠিকমতো তা করতে পারলে চিন্তা থাকে না। তবে গ্লকোমা ধরা পড়ার আগেই যে পরিমাণ নার্ভ (এবং তার ফলে দৃষ্টি) ক্ষতিগ্রস্ত আছে তা ফেরানো যায় না।

কী মনে রাখব?

আমার লেখাটিতে এতদূর আসার ধৈর্য যেসব পাঠকেরা দেখিয়েছেন তাঁদের বলার যে আপনার পুরোটাই ভুলে যাবার মতো স্বাভাবিক অধিকার আছে। তবে কয়েকটা বিষয় মনে রাখলে কারও কারও মঙ্গল হতে পারে।

১. গ্লকোমা রোগটা খুব একটা অসাধারণ নয়, সবারই হতে পারে এবং প্রাথমিক অবস্থায় কোনো লক্ষণ না থাকার প্রবল সম্ভাবনা।
২. এটা সারানো যায় না, তবে আটকে রাখা যায় ভালোমতো, তাড়াতাড়ি ধরতে পারা তাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ।
৩. সেই কারণেই নিয়মিত এবং সময়মতো ডাক্তার দেখানো আরও গুরুত্বপূর্ণ।
৪. ঠিকমতো ড্রপ দিয়ে গেলেই চলে (ডাক্তারের পরামর্শমতো) অধিকাংশ সময়—কারণ অপারেশন খুব কম সময়ই দরকার হয়। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সোহম সরকার, এমবিবিএস, এমএস, চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

একক মাত্রা

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস

সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র

পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে

গ্রাহক চাঁদা:১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)

আজীবন গ্রাহকেরা পুরোনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন

যোগাযোগ: ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭

দূরভাষ: ৯৮৩০২৩৬০৭৬ / ৯৮৩০৪৯৩২৩৯

রিপোর্ট

নিষিদ্ধ কাশির ওষুধ

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র জুন-জুলাই ২০১৬ সংখ্যায় প্রচ্ছদ নিবন্ধ ছিল—৩৩৭টা ওষুধ নিষিদ্ধ হল। আসলে নানা ওষুধ মিলিয়ে-মিশিয়ে তৈরি ৩৩৭টা 'ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন' নিষিদ্ধ করেছেন সরকার। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা বলে, ক্ষতিকর বলে নিষিদ্ধ হবার পরেও সেইসব ওষুধ বাজারে চলে। তাই তাদের নিয়ে এক-এক করে আলোচনা করছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**। এবারে প্রথম দফায় নিষিদ্ধ কাশির ওষুধ নিয়ে কিছু কথা।

২০১৬-র ১০ মার্চ সরকার ৩৩৭টা ওষুধ নিষিদ্ধ করার চার দিন পর মার্কিন ওষুধ কোম্পানি ফাইজার ঘোষণা করে তারা বাজার থেকে তাদের বহুল-প্রচলিত কাশির ওষুধ কোরেক্স (Corex) তুলে নিচ্ছে। কোরেক্স অ্যালার্জির ওষুধ ক্লোরফেনিরামিন ম্যালিয়েট এবং কাশির দমক কমানোর ওষুধ কোডিনের মিশ্রণ। সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ S.O.909(E) অনুযায়ী এই মিশ্রণ মানুষের জন্য ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। মনে রাখতে হবে, কোরেক্স ক্ষতিকর ঠিকই, কিন্তু লাগাতার প্রচার ও অন্য নানা

বহুল-প্রচলিত কাশির সিরাপ ফেন্সেডিল (Phensedyl)। মার্কিন ওষুধ কোম্পানি অ্যাবোট ল্যাবরেটরি লিমিটেড এই ফেন্সেডিল-এর প্রস্তুতকারক। অ্যাবোটের ভারতে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ব্যাবসার ৩ শতাংশেরও বেশি আসে ফেন্সেডিল থেকে।

উপায়ে ডাক্তার ও সাধারণ মানুষের কাছে একে খুব আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছিল। এপ্রিল ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ অবধি ১৭৬ কোটি টাকার কোরেক্স বিক্রি হয়েছিল।

একই উপাদানে তৈরি আরেকটা বহুল-প্রচলিত কাশির সিরাপ ফেন্সেডিল (Phensedyl)। মার্কিন ওষুধ কোম্পানি অ্যাবোট ল্যাবরেটরি লিমিটেড এর প্রস্তুতকারক। অ্যাবোটের ভারতে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ব্যাবসার ৩ শতাংশেরও বেশি আসে ফেন্সেডিল থেকে। ২০১০-এ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট মেডিসিনাল ইউনিট হেলথ অ্যাকশন ইন্টারন্যাশনাল-এশিয়া প্যাসিফিকের অর্থানুকুল্যে ভারতের বাজারে অপ্রয়োজনীয় মিশ্র ওষুধ নিয়ে অধ্যয়ন করার সময় আমরা জানতে পারি—২০০৯-এর ডিসেম্বরে পূর্বাঞ্চলে সবচেয়ে বেশি টাকার ব্যাবসা করেছিল ফেন্সিডিল, তৃতীয় স্থানে ছিল কোরেক্স। ১৯৮২-তে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে অপ্রয়োজনীয় ওষুধ নিষিদ্ধ হওয়ার পর আমাদের দেশ থেকে ফেন্সিডিল কাফ সিরাপ চোরাই চালান হয় সেখানে—মূলত নেশা করার জন্য।

১৩ বছর ধরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকায় কোনো অ্যান্টিটাসিভ নেই, সত্যি বলতে কি কোনো কাশির ওষুধই নেই।

একই উপাদান-সম্বলিত আর কোন কোন কাশির ওষুধে আছে খুঁজে দেখছিলাম ওষুধের বাণিজ্যিক তালিকা CIMS (Current Index of Medical Specialities)-এর অক্টোবর ২০১৫-জানুয়ারি ২০১৬ সংখ্যা থেকে। আরও ১৫টা ব্র্যান্ড পাওয়া গেল।

১. এস্কোরিল-সি (Ascoril-C)—গ্লেনমার্ক
২. কোডেক্টাস (Codectusss)—ক্যাডিলা
৩. কোডো-কিউ (Codo-Q)—আইপিসিএ
৪. কোডোকাফ (Codokuff)—জাইডাস
৫. কোডিলেক্স (Codylex)—অ্যাংলোফ্রেঞ্চ
৬. কোডজি (Codzi)—এফডিসি
৭. কোসোমি-এলসিডি (Cosome-LCD)—মার্ক
৮. ডায়ালেক্স-ডিসি (Dialex-DC)—ডা. রেড্ডি'স
৯. এক্সকোডিন (Excodin)—গুজারাট টার্স
১০. মিট'স লিংক্টাস কোডিন (Mit's Linctus Codeine)—অ্যাস্ট্রাজেনেকা
১১. অটোড্রিল (Otodril)—সলিটেয়ার
১২. টসেক্স (Tossex)—এএইচপিএল

১৩. ট্রাস্টিল-সিডি (Trustyl-CD)—এএইচপিএল

১৪. জেনোকফ-ডি (Trustyl-CD)—এএইচপি এল

১৫. এক্সএল-৮০ (XL-80)—ডিডব্লুডি

এই সব ক-টা ওষুধ কিন্তু নিষিদ্ধ ১৯৯৯-এর ১৯ মে থেকেই। সরকারি আদেশ GSR No. 395 (E) অনুযায়ী 'Fixed dose combination of centrally acting antitussive with antihistamine, having high atropine like activity in expectorants' অর্থাৎ ''কেন্দ্রীয়ভাবে (মস্তিষ্কে) কাজ করে এমন কাশি কমানোর ওষুধের সঙ্গে অ্যাট্রোপিনের মতো প্রভাব বেশি আছে এমন কফ বার জন্য অ্যান্টিহিস্টামিনিকের মিশ্রণ''—এটা নিষিদ্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা ব্যাবসা করেছে। নতুন নিষেধাজ্ঞা এই ব্যাপারে অনেকটা পরিষ্কার করে বলেছে বলেই বহুজাতিক কোম্পানি এবারে তাদের লাভজনক ব্র্যান্ড তুলে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

সবচেয়ে ভালো কাশির ওষুধ হল—জল বেশি খাওয়া, গরম জলের ভাপ নেওয়া, গলা খুসখুস করলে হালকা গরম নুন-জলে কুলকুচি করা।

কাশির দমক কমানোর ওষুধ তখন দরকার যখন কাশি কোনো কাজে আসছে না; অর্থাৎ কেশে যখন শ্বাসপথ থেকে বার করার কিছু নেই; এবং যখন কাশির জন্য রোগীর ক্ষতির সম্ভাবনা—যেমন পেটে কোনো বড়ো অপারেশনের পর। কাশির দমক কমানোর ওষুধগুলোকে বলে অ্যান্টিটাসিভ (antitussive)। দু-ধরনের অ্যান্টিটাসিভ হয়—নারকোটিক অ্যান্টিটাসিভ, যেগুলোতে নেশা হতে পারে, আর নন-নারকোটিক অ্যান্টিটাসিভ। প্রথম ধরনের ওষুধগুলো হল—কোডিন, ডাই- হাইড্রোকোডিন, হাইড্রোকোডিন, হাইড্রোমরফেন। দ্বিতীয় ধরনের ওষুধ হল—ডেক্সট্রোমেথরফ্যান প্রভৃতি। নারকোটিক অ্যান্টিটাসিভ ব্যবহার অভ্যাসে পরিণত হয়, ওষুধের ওপর রোগীর শারীরিক ও মানসিক নির্ভরতা তৈরি হয়। ওষুধ বন্ধ করলে অসুবিধা হয়। জেনে রাখা ভালো বছর ১৩ ধরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকায় কোনো অ্যান্টিটাসিভ নেই, সত্যি বলতে কি কোনো কাশির ওষুধই নেই।

অ্যান্টিহিস্টামিনিক বা অ্যালার্জির ওষুধের প্রসঙ্গে আসা যাক। কাশির ওষুধে ব্যবহার হয় সেট্রিজিন, ফেনিরামিন, ক্লোরফেনিরামিন, প্রোমেথাজিন, ইত্যাদি। অ্যালার্জির কারণে হাঁচি বা কাশি হলে তা এসব ওষুধে কমে বটে কিন্তু এরা কফকে আঠালো করে দেয়, কেশে সহজে কফ বার করা যায় না, ফুসফুসে কফ জমে গিয়ে বেশি ক্ষতি হয়। তবু এসব ওষুধ খেলে লোকে আরাম বোধ করেন, কেননা এগুলো খেলে ঝিমুনি আসে।

এবারে সরকার যে ৩৩৭টা মিশ্রণ ওষুধ নিষিদ্ধ করেছে তার মধ্যে ১৬১ রকম হল সর্দি-কাশির ওষুধ। কোন কোন ব্র্যান্ড এ সবের মধ্যে পড়ে তা *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র পাঠক-পাঠিকাদের জানানোর ইচ্ছে রয়েছে। কিন্তু বুঝতেই পারছেন এ এক বিশাল কাজ। প্রথমে আমরা বহুল-প্রচলিত মিশ্রণটিকে বেছে নিলাম। তবে মনে রাখবেন সব কাশির ওষুধই অপ্রয়োজনীয়।

সবচেয়ে ভালো কাশির ওষুধ হল—জল বেশি খাওয়া, গরম জলের ভাপ নেওয়া, গলা খুসখুস করলে হালকা গরম নুন-জলে কুলকুচি করা।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকার সম্পাদক

advt.

অনীক

'অনীক' পত্রিকা বিগত ৫০ বছরের বেশি ধরে চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক, প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা - ৭০০০০৯

ফোন—৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

ওষুধ কিনতে গিয়ে এক ভয়ংকর সত্যের মুখোমুখি

সৌম্য সেনগুপ্ত

আমার বোনের কিছুদিন আগে একটি অপারেশন হয়। ল্যাপারোস্কোপি করা হয়। বিশেষ কারণে চামড়ায় বাসা বাঁধা জীবাণুর দ্বারা সংক্রমণ ঘটে, যার মোকাবিলা করার জন্য শল্যচিকিৎসক ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন নামের একটি ওষুধ খেতে বলেন। মাত্রা ছিল ৫০০ মিলিগ্রামের ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন ট্যাবলেট দিনে ২টি করে ১০ দিন খেতে হবে। সঙ্গে শল্যচিকিৎসক এও বুঝিয়ে বললেন, এই ধরনের ইনফেকশন খুব বিরল এবং ক্ষেত্রবিশেষে এই ধরনের ইনফেকশন-ঘটানো জীবাণুকে সফলভাবে নিকেশ করতে প্রয়োজনে আরও ৭ দিন, অর্থাৎ মোট ১৭ দিনও ওষুধটি খেতে হতে পারে।

সেই ওষুধ কিনতে গিয়ে ভারতের ওষুধ বাজারের যে ভয়ংকর রূপ আমরা দেখলাম, যে হাতে গরম অভিজ্ঞতা আমাদের হল তা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতেই এই লেখা।

আমরা বাঁকুড়া জেলার এক ছোটো শহরে থাকি। ওষুধটি বহুলব্যবহৃত নয়। তাই আমাদের কাছের শহর বিষ্ণুপুর থেকে আমাদের এক দাদা ওষুধটা এনে দিলেন। ব্র্যান্ডনাম ক্ল্যারিবিড ৫০০ (Claribid 500), চারটি ট্যাবলেটের দাম পড়ল ৪৮২ টাকা। পরদিন আমি ওই একই দোকানে গিয়ে দোকানদার ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, ''দাদা ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন ৫০০ মিলিগ্রামের সবচেয়ে কমদামি কী ট্যাবলেট আছে?'' এই একই ধরনের অনুরোধ তিনি আমার কাছে আগেও পেয়েছেন। একবার চোখ তুলে আমাকে দেখে, খুঁজে খুঁজে একটা পাতা আমাকে এনে যা বললেন তা শুনে নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না—''দেখুন ভাই, এইটা, ১২৯ টাকা পাতা''। স্ট্রিপটা হাতে নিয়ে দেখি একই ওষুধ ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন ৫০০, ব্র্যাণ্ড নাম বায়োক্টার ৫০০ (Bioctar 500)। আমরা জানি ওষুধটা দোকানদার আরও অনেক কম দামে কিনেছেন। অনুরোধ করলাম দাদা, একটু ছাড় দিন। রাজি হলেন, দাম নিলেন ১২০ টাকা। চারটে ট্যাবলেটে সাশ্রয় ৩৬২ টাকা। আমার বোনকে ১৭ দিনই ওষুধটি খেতে হয়েছিল, অর্থাৎ ৮ পাতা ওষুধ কেনায় আমাদের মোট সাশ্রয় প্রায় ৩৬২ × ৮ = ২৮৯৬ টাকা। অবাক হওয়ার শেষ এখানেই নয়। পরে www.medguideindia.com ওয়েবপেজ-এ গিয়ে দেখতে পেলাম ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন ৫০০ মিলিগ্রাম-এর ট্যাবলেট ৩২টি ব্র্যান্ড নামে পাওয়া যায়, যার সর্বনিম্ন দাম কত জানেন? ১০ টা ট্যাবলেট -এর দাম মাত্র ৫০ টাকা![১] ওই ব্র্যান্ডের ওষুধ পেলে ওষুধের পুরো কোর্স কমপ্লিট করতে আমাদের খরচ হত মাত্র ১৫০ টাকা। একটাই ওষুধ, একই মাত্রা, একই কাজ, একটার দাম বড়ি প্রতি ৫ টাকা, আরেকটির দাম বড়ি প্রতি ১২০ টাকা।

এই অব্দি পড়ে কোনো কোনো পাঠকের মনে হতে পারে, বলেন কী?

> একটাই ওষুধ, একই মাত্রা, একই কাজ, একটার দাম বড়ি প্রতি ৫ টাকা, আরেকটির দাম বড়ি প্রতি ১২০ টাকা।

১২০ টাকা আর ৫ টাকায় কোনো তফাত নেই? না গুণগত কোনো তফাত নেই, যা আছে সেটা হল শুধু দামের। ওষুধটা বানাতে কোম্পানির খরচ খুবই কম পড়ে, তারা যা খুশি দাম ছেপে রাখে। সোজা কথায় বলা ভালো এখানে সরকারের বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ নেই বরং আছে প্রশ্রয়।

আরও কয়েকটি মাথা খারাপ করা তথ্যপ্রমাণ আপনাদের কাছে রাখছি। লিঙ্কটা ছোটো করে রাখলাম উৎসাহী পাঠক সুযোগ পেলে লিঙ্কে গেলে www.medguideindia.com-এ ওই নির্দিষ্ট পেজে পৌঁছে যাবেন।

ওষুধের নাম ও কী কাজে ব্যবহৃত হয়	১টি ট্যাবলেট তৈরি করতে কোম্পানির খরচ[২]	www.medguideindia.com-এ কতগুলো ব্র্যান্ড নামে পাওয়া যায়	সবচেয়ে কমদামি ব্র্যান্ড নাম ও তার প্রতি ট্যাবলেটের দাম	সবচেয়ে বেশি দামি ব্র্যান্ড নাম ও তার প্রতি ট্যাবলেটের দাম
অ্যালবেন্ডাজোল ৪০০ মিলিগ্রাম কৃমিনাশক	৮৫ পয়সা	৩৬২	Albent 400 mg ৯৯ পয়সায় বেচে Acto Pharmaceutical Lab	Wormivon 400 mg ১২০ টাকায় বিক্রি করে Von Remedies[৩]
অ্যামলোডিপিন ৫ মিলিগ্রাম। ব্লাড প্রেশার কমায়	১০ পয়সা	১৭২	Dipin 5mg ৩০ পয়সা	Amlogard 5 mg ৮ টাকা ৩০ পয়সা[৪]
অ্যাটিনলল ৫০ মিলিগ্রাম। ব্লাড প্রেশার কমায়	১৫ পয়সা	১১৮	Elon নামে ৩৬ পয়সায় বেচে Elikem Pharma	Tenormin 50 নামে Abbott বেচে ৩ টাকা ৭৯ পয়সায়[৫]

ব্যাপারটা অনেকটা এইরকম, একটা মুরগি তিনটি ডিম পাড়ল, একটা আপনি বাড়িতে সিদ্ধ করে খেলেন, দাম পড়ল ৫ টাকার কাছাকাছি, আপনার কাছাকাছি বড়ো রেস্টুরেন্টে যান, ১০ টাকা মিনিমাম। আর বড়ো পাঁচতারা হোটেলে গেলে ৫০-এর উপর তো বটেই!

দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সমাজে এই ভাবনাটাকে লালিত করা হয়েছে যে, যত বড়ো কোম্পানি, ওষুধ যত দামি, তার ওষুধে কাজ তত বেশি। না। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র পাঠকমণ্ডলী নিশ্চয়ই জানেন, অনেক কিছুর মতোই ওষুধের দামের বিষয়টা এই সমীকরণে পড়ে না। এবার থেকে ওষুধের স্ট্রিপটা যদি একটু খুঁটিয়ে দেখি, দেখব, বেশিরভাগ বড়ো কোম্পানিই ওষুধটা ছোটো কোম্পানিকে দিয়ে বানায় আর মার্কেটিং করে নিজেরা। মানে ফাইভস্টার হোটেলের ডিমটা আপনার পাশের মাসির বাড়িতেই যেন সিদ্ধ করা হয়েছে, আর বেচছে ফাইভস্টার।

এখনও যদি কারও মনে কোনো খটকা থাকে তার জন্য দু-টি মাত্র তথ্য রাখি—

সিপলা কোম্পানি সিপ্রোফ্লক্সাসিন ৫০০ মিলিগ্রাম-এর ট্যাবলেট ৫টি বিভিন্ন নামে বাজারজাত করে। যেখানে সিপটেক ৫০০ (Ciptec 500) ১০ টি ট্যাবলেটের দাম ৫৯ টাকা ৪২ পয়সা সেখানে সিপলক্স ওডি (Ciplox OD) ১০ টা ট্যাবলেট ১১২ টা ৩০ পয়সায় বেচে।[৬] দাম দেখুন প্রায় দ্বিগুণ। আর Ultimedix কোম্পানি সিপ্ল্যাক (Ciplac) নামে মাত্র ৬ টাকায় বিক্রি করে।

নোভারটিস (Novertis), জোলেড্রোনিক অ্যাসিড নামে ৪ মিলিগ্রাম -এর ইনজেকশন জোলমেটা-র (Zolmeta 4 mg), দাম রেখেছে ১৫,২১৩ টাকা, সেখানে জোল্টেরো (Zoltero 4 mg) নামে বিক্রি করছে ১৭,০০০ টাকায়। তফাত মাত্র হাজার দেড়েক টাকা। সেখানে ওষুধটি GLS Pharmaceuticals Pvt Ltd কোম্পানির Zoleget (4 mg), নামে কিনলে দাম পড়বে মাত্র ২৬৫ টাকা।[৭]

দেখুন একই ওষুধ, একই কোম্পানি, একাধিক ব্র্যান্ড নামে বিক্রি করছে শুধু তাই নয়, তাদের দামের কী ভয়ানক পার্থক্য দেখুন!! বেশি নামি দামি কোম্পানির দামি ওষুধের প্রতি বেশি ভরসাকারীরা এবার একই কোম্পানির বেশি দামি ব্র্যান্ড নেবেন না কম দামের?

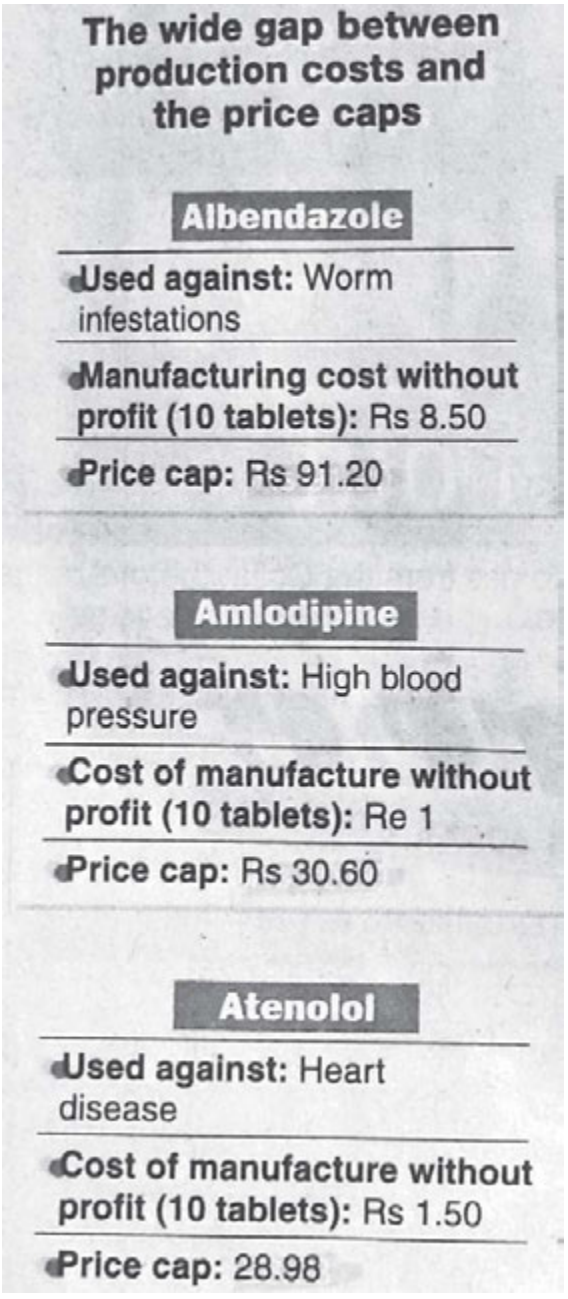

চিত্র ১. দ্য টেলিগ্রাফ ক্যালকাটা সান ডে, ২৪ নভেম্বর ২০১৩ তৈরির খরচের কত বেশি দামে ওষুধ বিক্রির অনুমোদন সরকার দিয়ে রেখেছেন!

এখন কারও কারও মনে হতে পারে, আরে আমাদের দেশে ভেজাল ওষুধ তো আছে, তাই না? ঠিকই, সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা কখনো হতে পারে। তবে আমরা সবাই জানি ৫০০ টাকার নোট জাল হয়, ৫০ পয়সা নয়। ভেজালকারীরা নামি দামি ওষুধেরই নকল বানাবে, তাতেই তাদের লাভ। আর ওষুধ কেনার সময় যদি ওষুধের বিল আমরা নিই, এবং ব্যাচ নং দেখে মিলিয়ে নিই তাহলে ভেজালের সম্ভাবনা প্রায় শূন্যে নামিয়ে আনতে পারি।

এগুলো তো কেবল প্রয়োজনীয় ওষুধের দামের কথা জানলাম। এ ছাড়া ভারতের ওষুধ বাজারে লক্ষাধিক ওষুধ পাওয়া যায় তার প্রায় ৯০% জুড়ে থাকা ভিটামিন টনিক, লিভার টনিক, খিদে বাড়ানোর ওষুধ, বুদ্ধি বাড়ানোর ওষুধ, প্রচলিত কাশির সিরাপ জাতীয় ফালতু ওষুধ, অবৈজ্ঞানিক মিশ্রণ ওষুধ (যেমন নরফ্লক্স টিজেড) বা নিষিদ্ধ ওষুধের কথা আমরা আর ক-জনই বা জানার সুযোগ পাই?

সত্যি, ভাবলে শিউরে উঠতে হয়, কী ভয়ংকরতম প্রতারণা চলছে মানুষের জীবনের বিনিময়ে, মানুষের রক্তের বিনিময়ে। আসুন আমরা সমবেতভাবে তীব্র প্রতিবাদ জানাই এসবের বিরুদ্ধে। সোচ্চার হই ব্র্যান্ডনামে ওষুধ চালু রাখার মাধ্যমে প্রতারণা চালানো নিষিদ্ধ করার দাবিতে।

তবে এক্ষুনি যেটা করতে পারি—প্রিয় চিকিৎসককে অব্যাবসায়িক নামে ওষুধ লেখার অনুরোধ করতে পারি, আর খোঁজ করতে পারি ওষুধটির সবচেয়ে কম দামি ব্র্যান্ডের। নিশ্চিন্তে। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

সূত্র: ১. http://tinyurl.com/j5e75cl ২. *The Telegraph* 24.11.2013 ৩. http://tinyurl.com/hcvavhd) ৪. http://tinyurl.com/hhn4mez ৫. http://tinyurl.com/hsfflns ৬. http://tinyurl.com/h4q2w5t ৭. http://tinyurl.com/hzabm8t

লেখক ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি, রাধানগর শাখা-র সঙ্গে যুক্ত।

অ্যালোপ্যাথি ওষুধ ও তার সাইড এফেক্ট

কোনো ‘প্যাথি’র ওষুধে সাইড এফেক্ট থাকতে পারে না ভাবা, আর চোখ বুজে রাস্তা পেরোলে গাড়ি অদৃশ্য হয়ে যাবার ফলে দুর্ঘটনা ঘটবে না ভাবা—এ-দুটো একই ব্যাপার। লিখেছেন **ডা. অর্ক বৈরাগ্য**।

প্রথমেই বলে রাখা ভালো অ্যালোপ্যাথি নামটাই গোলমেলে। জার্মানির হ্যানিম্যান সাহেব তাঁর আবিষ্কৃত হোমিয়োপ্যাথির সঙ্গে তৎকালীন মূল ধারার চিকিৎসা বিজ্ঞানকে আলাদা করার জন্যে এই অ্যালোপ্যাথি নামটি প্রচলন করেন। প্রকৃতপক্ষে একে বলা হয় মডার্ন মেডিসিন বা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান।

সাধারণভাবে আমাদের ধারণা থাকে যে অ্যালোপ্যাথি ওষুধ বড়ো বড়ো ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয় ও তাতে যা থাকে তা হল খাবারে মেশানো রঙের মতো বা দোলের আবিরের মতো বা জুতো পালিশের ক্রিমের মতো পুরোটাই ‘রং-কেমিক্যাল’! আর মোড়ের মাথায় বাতের ব্যথার আশ্চর্য মলম থেকে যাবতীয় হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, জড়িবুটি সবকিছুই দারুণভাবে বিশুদ্ধ পরিশোধিত ও ‘ন্যাচেরাল’!! অথচ কিছুদিন আগেই নেসলে কোম্পানির ম্যাগিতেও পাওয়া গেল ভারী ধাতু যারা কিছু না হলেও সরকারি সংস্থার রেগুলেশন ও গুণমান পর্যবেক্ষণের আওতায় আছে। সেই একই দেশে হোমিওপ্যাথি আয়ুর্বেদের মতো প্রায় বিনা রেগুলেশন ও গুণমান বিচারের বাইরে থাকা ওষুধগুলো কোন যুক্তিতে ‘রং কেমিক্যাল ফ্রি সম্পূর্ণ ন্যাচেরাল’ হয়ে যায় তা সত্যি ভেবে দেখার মতো।

ইতিহাসের দিকে তাকালে

ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথির প্রচলন করেন, তখন মূলধারার মেডিসিন একেবারে শৈশবদশায়। সার্জারি করার জন্যে অবশ বা অজ্ঞান করার ওষুধ তখনও আবিষ্কার হয়নি, বেশিরভাগ রোগের চিকিৎসা বলতে ছিল পার্জিং (purging) বা সোজা কথায় বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে শরীর থেকে তরল পদার্থ বের করে দেওয়া। মনে করা হত, রোগ হওয়ার মূল কারণ হল দূষিত বস্তু শরীরে জমে রয়েছে। কী অদ্ভুত তাই না? প্রায় ১৩০ বছর পরেও এই আদিম ধারণা থেকে আমরা এখনও বেরোতে পারিনি, তাই কোথাও কেটে গেলে বলি ‘বদ রক্ত’ বেরিয়ে যাওয়া ভালো, অথচ সেপ্টিসেমিয়া না হয়ে গেলে আজ অবধি রক্তের থেকে বিশুদ্ধ জিনিস আরেকটা পাওয়া মুশকিল। ব্রণ হলে ভাবি রক্তে টক্সিন জমেছে আর সেই টক্সিন বের করার জন্যে দোকান থেকে টনিক কিনে খাই। পলিসিথেমিয়া ভেরা নামের এক রোগ ছাড়া শিরা ফুঁড়ে রক্ত বের করা মডার্ন মেডিসিনে একটা পরিত্যক্ত চিকিৎসা, অথচ হানিম্যানের সময়ে সেটাই ছিল সব রোগের দাওয়াই। এগুলো হানিম্যানের সংবেদনশীল মন মেনে নিতে পারেনি বলে তিনি বিকল্প হিসেবে হোমিওপ্যাথির নির্মাণ করেন। কিন্তু গত ১৩০ বছরে মডার্ন মেডিসিনে আমুল পরিবর্তন ঘটে গেছে। আর সেই পরিবর্তনের দিকে চোখ বুজে থেকেছেন হ্যানিম্যানের উত্তরসূরিরা।

স্টেথোস্কোপের আবিষ্কারক রেনে লেনেক, ওয়েনবার্গার, ভার্কাও, লুই পাস্তুর, থেকে উইলিউয়াম অসলার ও আরও অনেক ডাক্তার তথা বিজ্ঞানী দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও যুক্তিকাঠামো অনুসরণ করে তিল তিল করে গড়ে তোলেন আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার শিল্প ও বিজ্ঞান। (আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স অফ মেডিসিন)। হিপোক্রেটিসের সময় থেকেই চিকিৎসাশাস্ত্রের শুরুর কথা বলতে বলা হয় ‘‘প্রথমে কোনো ক্ষতি কোরো না’’ (do no harm)। পার্জিং-এর যুগে অসলার’র বলতে চাইলেন, ‘‘প্রথমে কিছুই কোরো না’’ বা ‘‘The first duty of the physician is to educate the masses not to take medicine’’। তাঁরা দেখতে চাইলেন কোনো রোগ হলে শরীর নিজে কীভাবে প্রতিক্রিয়া করে, কীভাবে রোগ প্রতিহত করে, অনাক্রম্যতা গড়ে তোলে। শুরু হল প্যাথোফিজিওলজি আর ধীরে ধীরে আমরা বুঝতে পারলাম কোনো রোগ হলে তার সবচেয়ে বড়ো ডাক্তার, সবচেয়ে কাজের ওষুধ, সবচেয়ে নিখুঁত সার্জেন আমাদের শরীর নিজে। চিকিৎসাবিজ্ঞান শিখতে এসে তাই আমরা ডাক্তাররা প্রায় চার বছর স্টাডি করি এই প্যাথোফিজিওলজিকেই, আর ওষুধ দিতে শিখি পরবর্তী দু-বছরে।

নিজের শরীরকে চেনা

চিকিৎসাশাস্ত্রে যত রোগের কথা বলা আছে তার প্রায় ৪০-৫০ শতাংশ নিজে থেকেই সেরে যায়, কিংবা সারে সাময়িক বিশ্রাম এবং কষ্টলাঘবকারী বা সাপোর্টিভ কিছু সাধারণ ওষুধে। তাই সত্যি কথা বলতে ‘‘পিল ফর এভরি ইল’’ (প্রত্যেক রোগের জন্য একটা ওষুধ) একটি ভ্রান্ত ধারণা ও অতিকথন। কিডনি, লিভার, অন্ত্র, ফুসফুস ও ত্বক এই পাঁচটি অঙ্গ আমাদের শরীরে একটি দারুণ ভূমিকা একযোগে পালন করে, তা হল দূষিত পদার্থ শরীর থেকে বের করার কাজ। এই দূষিত পদার্থ শরীরে আসে কীভাবে? অন্ত্রে আসে খাবারের মাধ্যমে, যেমন রোগজীবাণু, ভারী ধাতু এবং ওষুধ। পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অধিকাংশ জীবাণু মেরে ফেলতে সক্ষম, (তাই যারা অনেকদিন ধরে অ্যান্টাসিড জাতীয় ওষুধ খান তাদের পেটে সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।) ভারী ধাতুগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্ত্রে শোষিত হয় না, মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়; যেটুকু শোষিত হয় তা পরবর্তী ডিফেন্স—লিভারে প্রতিহত হয় এবং পিত্তের দ্বারা আবার মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। যে সমস্ত টক্সিন লিভারকেও অতিক্রম করতে পারে তারা রক্তে চলে আসে, রক্তের মাধ্যমে সারা শরীরে ছড়িয়ে পরে, কোনো কোনো অঙ্গে জমা হতে পারে, এবং অবশেষে তৃতীয় ডিফেন্স কিডনির হাতে ধরা পড়ে ও মূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। ফুসফুস (যে সমস্ত দূষিত পদার্থ বাতাসে থাকে ও প্রশ্বাসের দ্বারা শরীরে ঢোকে) আর ত্বক ও কিছু কিছু টক্সিন নিশ্বাস ও ঘামের মাধ্যমে বের করে দিতে পারে, আর যারা কোনো অঙ্গে জমা হয়ে গেল, তারাও রক্তের মাধ্যমে কিছু সময় পর আবার লিভারে ফিরে আসে ও পিত্ত দিয়ে বেরিয়ে যায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে যেকোনো ওষুধ খেলে বা ইঞ্জেকশন নিলে তারও একই

পরিণতি হয়, কারণ আপনি মনে করেন এইটা ওষুধ আর ওইটা টক্সিন, কিন্তু আপনার শরীরের কাছে সবাই সমান। তাই প্যারাসেলসাস সতেরোশো শতকে অনেকটা ঠিকই বলেছিলেন— ''সব বিষই কম মাত্রায় ওষুধ, আর সব ওষুধই বেশি মাত্রায় বিষ''—আসলে সব বিষই কম মাত্রায় ওষুধ নয়, যদিও সব ওষুধই বেশি মাত্রায় বিষাক্ত। এই সব কিছুই আমরা জেনেছি আধুনিক বিজ্ঞানের কাছ থেকেই। প্রকৃতপক্ষে শরীরে যেকোনো কিছু প্রবেশ করলে যে সাইড এফেক্ট হতে পারে, সেটা আধুনিক বিজ্ঞানেরই শিক্ষা, আর কারও নয়।

ওষুধ তৈরি

একটা নতুন ওষুধ তৈরি করতে গড়ে সময় লাগে ১০ বছর, আর কোটি কোটি টাকা। এখনকার বেশিরভাগ ওষুধই তৈরি হয় গাছগাছড়া থেকে, যাদের অনেকগুলো হল অ্যালকালয়েড, যেমন অ্যাস্পিরিন, হার্টের ওষুধ ডিজিটালিস, ক্যান্সারের ওষুধ প্যাক্লিট্যাক্সেল। এগুলোর অপরিশোধিত আকারগুলোই ওষুধ হিসেবে আয়ুর্বেদে পাওয়া যায়। এগুলোকেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শোধন করে আধুনিক 'সম্ভাব্য নতুন ওষুধ' তৈরি করা হয়, তারপর মনুষ্যেতর জীবে তার প্রয়োগ করা হয়, তার কর্মক্ষমতা আর সাইড এফেক্ট জানার জন্যে। অসংখ্য 'সম্ভাব্য নতুন ওষুধ' তৈরি এই ধাপেই বাতিল হয়ে যায়, তার অকার্যকারিতা বা সাইড এফেক্টের জন্যে। যারা পাশ করে, তাদের আরও পরিশোধিত রূপটা ধাপে ধাপে ২০ জন, ১০০ জন, ১০০০ জন সুস্থ মানুষ ও রোগীদের ওপর প্রয়োগ করা হয়, মিলিয়ে দেখা হয়, সেই মুহূর্তে জানা, কর্মক্ষম ও লম্বা সময় জুড়ে প্রমাণিত চলতি ওষুধের থেকে তার কর্মক্ষমতা কতটা বেশি ও সাইড এফেক্ট কতটা কম। প্রমাণ হলে লাইসেন্স পেয়ে সেই ওষুধ বাজারে আসে। এখানেই শেষ নয়, বাজারে আসার পরও চলতে থাকে নজরদারি, ওষুধের দীর্ঘমেয়াদি সাইড এফেক্ট, কিছু মানুষের ওপর জিনগত বৈচিত্রের কারণে বিরল সাইড এফেক্ট সব মিলিয়ে দেখা হয়, আর তাই কখনো কখনো দেখি অনেক দিন বাজারে থাকার পর কিছু ওষুধ তুলে নেওয়া হচ্ছে, তার ওই ধরনের সাইড এফেক্টের জন্যে। এর সঙ্গে একথাটা বলে রাখা ভালো যে এই চিত্রটা হল খানিকটা আদর্শ চিত্র, কেননা ওষুধ কোম্পানিগুলো অনেক সময় কারচুপি করে, সঠিকভাবে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করে না, তথ্য গোপন করে। কিন্তু সেগুলো চিকিৎসাবিজ্ঞানীরাই জনসমক্ষে আনেন, কোনো 'ঐতিহ্যময়' চিকিৎসা পদ্ধতি সেই অপকর্ম ধরতে সক্ষমই নয়।

সাইড এফেক্ট যখন এফেক্ট

ধুতুরা গাছের ফল বেশিমাত্রায় বিষ। এই ফলে থাকা অ্যাট্রোপিন নামে এক রাসায়নিকের প্রভাবে হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হয়ে মৃত্যু হতে পারে। ধুতুরা ফল থেকে পরিশোধন করে এই অ্যাট্রোপিন ওষুধ বানানো হয়, আর আগাছানাশক বিষের বিষক্রিয়ায় সেটিই একমাত্র জীবনদায়ী ওষুধ। মিনক্সিডিল নামের একটি ওষুধ অনেক আগে ব্যবহার করা হত উচ্চ রক্তচাপ কমাতে, তার সাইড এফেক্ট দেখা গেল শরীরে অবাঞ্ছিত লোমের উদ্ভব। মিনক্সিডিল লোশন এখন চুল পড়ে যাওয়ার কার্যকর ও জনপ্রিয় চিকিৎসা। অ্যাসপিরিন-এর সাইড এফেক্ট হল রক্ত জমাট বাধা আটকানোর ফলে স্বতঃস্ফূর্ত রক্তক্ষরণ। কম ডোজের অ্যাস্পিরিন এখন হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের ওষুধ, আর তাতে এই রক্ত জমাট বাধা আটকানোর ধর্মটাই কাজে লাগে। অন্যদিকে সর্পগন্ধা থেকে পাওয়া রেসারপিন উচ্চ রক্তচাপে দিলে সাইড এফেক্ট হল আত্মহত্যার প্রবণতা, তাই আধুনিক চিকিৎসায় এটি রিজার্ভ ড্রাগ—খুব বিরল ক্ষেত্রে সাবধানে দেওয়া হয়। অথচ আয়ুর্বেদে এটি প্রায়শই দেওয়া হয়। একই জিনিস আয়ুর্বেদ ওষুধ হিসেবে গেলে ক্ষতি করবে না, এটা ভাবার কোনো কারণ নেই, কিন্তু আমাদের বুদ্ধিমান আইনপ্রণেতারা সেরকমই স্থির করেছেন!

শেষ কথা

'যার এফেক্ট আছে তারই সাইড এফেক্ট থাকবে'। নামটা থেকেই বোঝা যায়, পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়ন এর সাধারণ ও সর্বজনীন নিয়মগুলোকে অগ্রাহ্য করা প্রাচীন 'কাল্ট' শাস্ত্র হোমিয়োপ্যাথির স্বনিয়মেই এফেক্ট থাকারই কথা নয়, তাই তার সাইড এফেক্টও হাস্যকর। হোমিওপ্যাথি ওষুধে সাধারণত যে মাত্রায় লঘুকরণ বা ডাইলিউশন করা হয়, তার ফলে হোমিওপ্যাথিক ফোঁটা বা মিষ্টি-গুলিতে 'ওষুধ' দ্রব্যটির একটিও অণু থাকে না। সুতরাং এফেক্ট বা সাইড-এফেক্ট কোনোটাই এই ওষুধে হয় না (মাদার-টিংচার বা কম লঘুকৃত ওষুধের কথা এখানে আনছি না)। তাহলে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবাবুরা রোগ সারান কীভাবে? সারান, কেন না অনেক রোগ নিজেই সেরে যায়, বা প্রকোপ কমে যায়। এছাড়া আছে স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত কিছু কার্যকর পরামর্শ। 'প্লাসিবো' এফেক্ট-এর ফলেও রোগী ওষুধ দিলেই কিছুটা ভালো হয়—ওষুধ কাজ না করলেও।

আয়ুর্বেদ তো ওষুধ হিসেবে দিচ্ছে সক্রিয় উপাদান, তাতে কাজও হতে পারে, কিন্তু তাকে প্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী ও সমস্ত পরীক্ষা আর প্রশ্নের উর্ধ্বে বলার আড়ালে তার সাইড এফেক্টগুলোও চাপা পড়ে যাবে। না হবে সেগুলোর ডাবল ব্লাইন্ড র‍্যান্ডমাইজড কনট্রোলড ট্রায়াল, না হবে টক্সিসিটির ল্যাব ও মানুষের ওপরে করা পরীক্ষানিরীক্ষা। শুধু গলায় জোর দিয়ে বলে, সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে ''আমাদের কোনো শাখা নেই'' বলার মতো ''আমাদের কোন সাইড এফেক্ট নেই'' এটা বারবার বললেই তো এতদিনকার বারে বারে প্রমাণিত সময়সিদ্ধ পদার্থবিদ্যার, রসায়নের, জীববিদ্যার, প্যাথোফিজিয়োলজির সাধারণ নিয়মগুলো আর ভুল প্রমাণ হয়ে যায় না। শরীরে প্রবেশ করা যেকোনো কার্যকর কিছুর সাইড এফেক্ট আকাশে সূর্য ওঠা বা পৃথিবীর সূর্যের চারপাশে ঘোরার মতোই সত্যি। (মনে রাখবেন আপনার শরীরে মেদ জমাটাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনার খাওয়ার সাইড এফেক্ট!) আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সবার আগে সাইড এফেক্টের সম্ভাবনা স্বীকার করে, আর সেখানেই থেমে না থেকে তার গোড়ায় গিয়ে পৌঁছায়, তাকে ভালোভাবে অধ্যয়ন করে তার থেকে বেরিয়ে আসার উপায় খোঁজে ও তাকে যথাসাধ্য কম করার চেষ্টা করে। সাইড এফেক্ট তাই আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে কোনো লুকিয়ে রাখার জিনিস নয়, এটি হল তার বৈজ্ঞানিক প্রগতিশীলতার প্রকৃত উপকরণ, তার উৎকর্ষের মাপকাঠি।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অর্ক বৈরাগ্য, এমবিবিএস।

১৯৭৯-র ডিসেম্বরে দল্লিরাজহরার ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট হাসপাতালে চিকিৎসক ও সেবিকাদের অবহেলায় প্রাণ হারান লোহা-খনির ঠিকাদারি শ্রমিক কুসুমবাই। প্রসূতি কুসুমবাই ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘের উপাধ্যক্ষা ছিলেন। কুসুমবাইয়ের মৃত্যুতে শ্রমিকরা শপথ নেন নিজেদের এক মাতৃসদন গড়ে তোলার। শেষে মাতৃসদন নয়, গড়ে ওঠে শহীদ হাসপাতাল। আর এক বিশাল জনস্বাস্থ্য আন্দোলন।

কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

ঠিক ৩৩ বছর পর ২০১২-এর ২ ডিসেম্বর চিকিৎসকদের অবহেলায় প্রাণ যায় সাংবাদিক সন্দীপ্তা চ্যাটার্জীর। ‘‘সন্দীপ্তাকে মনে রেখে’’ মহিলাদের স্বাস্থ্যসচেতনতার এক প্রয়াস।

কুসুমবাই ও সন্দীপ্তা যেন এক সূত্রে বাঁধা। তাই *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকায় কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে ‘‘মেয়েদের স্বাস্থ্য ভুবন’’।

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

বন্ধ্যাত্বের একমাত্র এবং অব্যর্থ চিকিৎসা কি আইভিএফ?

আই ভি এফ তথা 'টেস্টটিউব বেবি' বন্ধ্যা দম্পতির একমাত্র আশা বলে বহুল-বিজ্ঞাপিত, কিন্তু বিজ্ঞান কি তাই বলে? লিখছেন **ডা. কাঞ্চন মুখার্জি।**

স্বামীর বয়স ৩২, বহুজাতিক কোম্পানিতে কর্মরত। স্ত্রীর বয়স ২৭, বর্তমানে হোমমেকার। মাত্র এক বছরের বিবাহিত জীবন। আত্মীয় পরিজনেরা ইতিমধ্যে সন্তানহীনতার কথা বলতে শুরু করেছেন। কারও দাদু হবার শখ, কারও বা দিদা। সন্তান এসে গেলে দম্পতিও যে খুশি হবেন না তা নয়। ইতিমধ্যে কিছু ঠাকুর দেবতাও করা হয়ে গেছে। জ্যোতিষীর পরামর্শে দু-একটা আংটি ধারণও হয়েছে। পাড়ার ছেলেরা তো এবার দরজায় কার্তিক ঠাকুরও ফেলেছিল। সবে মিলে দম্পতির ওপর ভীষণ চাপ—পারিবারিক ও সামাজিক। নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণের অগ্নিপরীক্ষা, উত্তীর্ণ না হলে যেন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই রসাতলে যাবে। অতএব শরণাপন্ন প্রজনন বিশেষজ্ঞের। অভিজ্ঞ চিকিৎসক মহাশয় ধৈর্য সহকারে চিন্তিত যুগলের কথা শুনলেন এবং বুঝলেন। বন্ধ্যাত্বের কারণ অনুসন্ধানে কিছু নিরীক্ষা তো করতেই হয়। স্বামী-স্ত্রীর রক্ত পরীক্ষা, আলট্রাসোনোগ্রাফি, এক্স-রে ইত্যাদি নানা পরীক্ষাই হল। একমাসের মধ্যে পরীক্ষার ফল সমেত তাঁরা আবার হাজির। সামান্য হলেও স্বস্তি, সব পরীক্ষার ফলই নর্ম্যাল। ডাক্তারি পরিভাষায় এঁদের সমস্যাকে চিহ্নিত করা হল 'unexplained infertility' হিসেবে। এবার চিকিৎসার পালা।

বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসার অনেকগুলি উপায় বা পথ (options) রয়েছে সেই উপায়গুলি জানার আগে আমাদের জানতে হবে কাদের চিকিৎসা দরকার এবং কখন কোন চিকিৎসা করা দরকার। ব্যক্তিগত পরিস্থিতি অনুযায়ী কার কী চিকিৎসা প্রয়োজন তা নির্ধারণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের। সাধারণ মানুষজনের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিই আমার এই রচনার উদ্দেশ্য যাতে তাঁরা একেবারে দিশেহারা না হন, বিপন্ন বোধ না করেন।

বন্ধ্যাত্ব কাকে বলে?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী কমপক্ষে এক বছর নিয়মিত চেষ্টার পরও গর্ভসঞ্চার না হলে তাকে বন্ধ্যাত্ব বলা যায়। [Infertility is 'a disease of the reproductive system defined by the failure to achieve a clinical pregnancy after 12 months or more of regular unprotected sexual intercourse']। অর্থাৎ ন্যূনতম একবছর নিয়মিত চেষ্টা করার আগে চিকিৎসা শুরু করা উচিত নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে 'নিয়মিত' বলতে কী বোঝানো হয়? সন্তানধারণের ইচ্ছুক যুগলের প্রতি দুই বা তিনদিন অন্তর যৌন মেলামেশা না হলে তাকে 'নিয়মিত' বলা যায় না।

> কমপক্ষে এক বছর নিয়মিত চেষ্টার পরও গর্ভসঞ্চার না হলে তাকে বন্ধ্যাত্ব বলা যায়।

একেবারে গোড়ার কথা

যেকোনো 'জুড়ি'-র (কাপল-এর) সন্তানধারণের পরিকল্পনার প্রথম ধাপ হওয়া উচিত প্রি-প্রেগন্যান্সি কাউন্সেলিং অর্থাৎ সন্তানধারণের আগেই ব্যাপারটা ভালো করে আলোচনা করা। হবু মাতা-পিতার যদি কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা হওয়া উচিত গর্ভধারণের আগেই। কিছু কিছু রোগ থাকে যেমন মায়ের ডায়াবেটিস, মৃগী—যার উপযুক্ত চিকিৎসা আগে থেকে না হলে সন্তানের ওপর প্রভাব পড়তে পারে বা বিকলাঙ্গ শিশু জন্মানোর সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে। কিছু ওষুধপত্র মা-কে গর্ভাবস্থায় একেবারেই খাওয়ানো উচিত নয়—এ সম্পর্কে আগে থেকে সচেতন হওয়া ভালো। আগে থেকে সাবধান হলে কিছু বংশগত রোগও প্রতিরোধ করা সম্ভব। যেমন হবু পিতা-মাতা দু-জনেই থ্যালাসেমিয়া

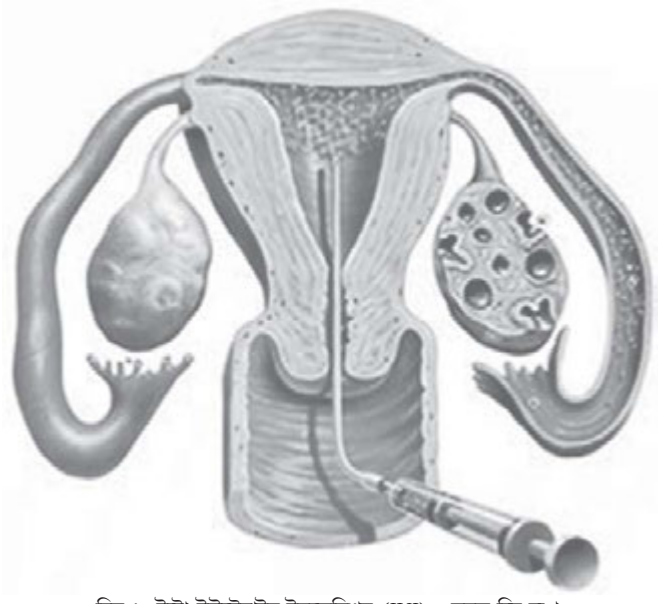

চিত্র ১. ইন্ট্রা-ইউটেরাইন ইনসেমিশন (IUI)—সরল চিত্র রূপ

রোগের বাহক হলে তাঁদের সন্তানের থ্যালাসেমিয়া রোগ হওয়ার সম্ভাবনা ২৫ শতাংশ; আগে থেকে জানা থাকলে এই মারণরোগের প্রতিরোধ করা সহজ হয়ে যায়। তবে কোনো রোগবালাই না থাকা মানুষের সংখ্যাই বেশি। এমনকী তাঁদেরও অন্ততপক্ষে একটি করে ফোলিক অ্যাসিড (Folic Acid) ভিটামিন ট্যাবলেট খাওয়া উচিত প্রেগন্যান্সি আসার আগে থেকেই। এতে সন্তানের কিছু কিছু জন্মগত ত্রুটির (যেমন নিউরাল টিউবের ডিফেক্ট) সম্ভাবনা কমানো যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল সন্তানধারণে ইচ্ছুক যুগলের দৈনন্দিন জীবনশৈলী স্বাস্থ্যকর হওয়া উচিত—যেমন তাঁদের ধূমপান ও অতিরিক্ত মদ্যপান এড়িয়ে চলা উচিত।

বন্ধ্যাত্ব কতটা 'সহজপ্রাপ্য'?

সারা বিশ্বে যেকোনো প্রদত্ত সময়ে আনুমানিক ছয় থেকে আট কোটি কাপ্‌ল বন্ধ্যাত্বের শিকার (World Health Organisation 2004)। বন্ধ্যাত্বের হারে আঞ্চলিক তারতম্য ধরে নিয়েও বলা যায় শতকরা আট থেকে বারো

সারা বিশ্বে আনুমানিক ছয় থেকে আট কোটি কাপ্‌ল বন্ধ্যাত্বের শিকার

জন 'জুড়ি'-র বন্ধ্যাত্ব থাকবেই। অর্থাৎ সমস্যাটি ভীষণ 'কমন', আর সেজন্যই এর সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সম্যক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। চিকিৎসকরা বন্ধ্যাত্বের দু-টি ভাগ করেন, প্রাইমারি (প্রাথমিক) ও সেকেন্ডারি (গৌণ)। যাদের কোনোদিন কোনো গর্ভসঞ্চার হয়নি তাঁরা প্রাথমিক গ্রুপে পড়েন। আর যাঁদের আগে অন্ততপক্ষে একবার প্রেগন্যান্সি এসেছে তাঁরা সেকেন্ডারি গ্রুপে পড়েন। সারা বিশ্বে প্রথম গ্রুপের সংখ্যাই বেশি। একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞরূপে আমার ব্যক্তিগত ধারণা, প্রতি পাঁচজন রোগীর মধ্যে অন্ততপক্ষে একজন আসেন বন্ধ্যাত্ব বিষয়ে পরামর্শ নিতে। তাঁদের মধ্যে কতজনের চিকিৎসা প্রয়োজন সেটা অন্য প্রসঙ্গ।

বন্ধ্যাত্বের কারণ

অনগ্রসর সমাজে এখনও নারীদেরই বন্ধ্যাত্ব-এর জন্য মূলত দায়ী করা হয়। বলাই বাহুল্য এধরনের মানসিকতা ভুল ও অত্যন্ত নিন্দনীয়। বন্ধ্যাত্বের শারীরিক কারণ খোঁজার আগে দেখতে হবে ইচ্ছুক যুগল নিয়মিত মেলামেশা করছেন কিনা। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় ভ্রান্ত ধারণাবশত তাঁরা ঋতুচক্রের ভুল সময়ে (Non-fertile সময়ে) মিলনের দ্বারা সন্তান ধারণের চেষ্টা করছেন। সহজভাবে দেখতে গেলে বন্ধ্যাত্বের এক-তৃতীয়াংশ কারণ নিহিত থাকে পুরুষ শরীরে, এক-তৃতীয়াংশ নারীর মধ্যে এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশে

সব দেশে সব ইচ্ছুক মাতাদের 'ফোলিক অ্যাসিড' ভিটামিন খেতে বলা হয়।

কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। নারীদের শরীরে যে সমস্ত রোগের জন্য বন্ধ্যাত্ব হতে পারে, যেমন জরায়ু বা ডিম্বনালীতে সংক্রমণ, ওভারিতে সিস্ট বা টিউমার অথবা এন্ডোমেট্রিয়োসিস—সেগুলির প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রাথমিক অবস্থায় রোগ ধরা পড়লে চিকিৎসার ফল ভালো হয়।

শরীরের ওজন বন্ধ্যাত্বের সম্ভাব্য কারণ

'শরীরের ওজন' বললেই প্রথমেই স্থূলত্বের কথা মনে আসে। কিন্তু অধিক মেদ এবং প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প মেদ—উভয় পরিস্থিতিই বন্ধ্যাত্বের কারণ হতে পারে। নারী ও পুরুষ দু-জনের ক্ষেত্রেই এই সূত্র প্রযোজ্য। শরীরের ওজন সঠিক আছে কিনা জানতে গেলে 'বডি মাস ইনডেক্স' (Body Mass Index) বা 'বি এম আই (BMI)-এর কথা বলতেই হয়। কারও ওজন যদি ৬০ কেজি হয় এবং উচ্চতা ১৬০ সেন্টিমিটার (১.৬ মিটার) হয় তাহলে তার BMI হবে।

$$\frac{৬০}{১.৬ \times ১.৬} = ২৩.৪$$

বিএমআই ১৮-র কম হলে তাকে 'কম ওজন' (underweight) বলা হয়। অন্যদিকে বিএমআই ২৫ বা তার বেশি হলে তাকে 'বেশি ওজন' (Overweight) বলা হয়। দুই ক্ষেত্রেই শরীরে স্বাভাবিক যৌন/জনন হরমোনের মাত্রা পরিবর্তিত হতে পারে। ফলে, নারীদের ক্ষেত্রে নিয়মিত ডিম্বাণু নিঃসরণে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। পুরুষদের ক্ষেত্রে কারণগুলি সরাসরি চিহ্নিত করা না গেলেও অত্যন্ত বেশি বা অত্যন্ত কম ওজনের মানুষের নানা ধরনের যৌন/জননগত অক্ষমতা দেখা গেছে।

গর্ভধারণের আগে অবশ্য কর্তব্য

বন্ধ্যাত্ব-সমস্যা থাকুক বা না থাকুক প্রত্যেক ইচ্ছুক যুগলেরই সন্তানধারণের পরিকল্পনা চলাকালীন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। তাঁদের যদি পূর্ব নির্ধারিত কোনো রোগবালাই থাকে তার যথাসম্ভব (Optimum) চিকিৎসা হয়ে থাকলে গর্ভাবস্থায় সমস্যা কম হয় এবং সন্তানের স্বাস্থ্যও সুরক্ষিত হয়। সারা বিশ্বে সব দেশে সব ইচ্ছুক মাতাদের 'ফোলিক অ্যাসিড' ভিটামিন খেতে বলা হয়। রোজ একটি করে এই ট্যাবলেট খেলে শিশু 'নিউরাল

টিউব ডিফেক্ট' (মস্তিষ্ক ও সুষুম্নকাণ্ডের সমস্যা) হবার সম্ভাবনা কমে আসে। 'ফোলিক অ্যাসিড' খুব একটা ব্যয়সাপেক্ষ ওষুধ নয়, কপাল ভালো থাকলে সরকারি হাসপাতালে বিনা মূল্যেও পাওয়া যেতে পারে।

আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে গর্ভধারণের আগে আর একটি পরীক্ষা অবশ্য কর্তব্য। পূর্ব ভারতে প্রতি দশ জনের মধ্যে একজন থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক। আর পিতা মাতা দু-জনেই বাহক হলে তাঁদের সন্তানের থ্যালাসেমিয়া রোগ হবার সম্ভাবনা ২৫ শতাংশ। এটি একটি মারণরোগ, কিন্তু প্রতিরোধযোগ্য।

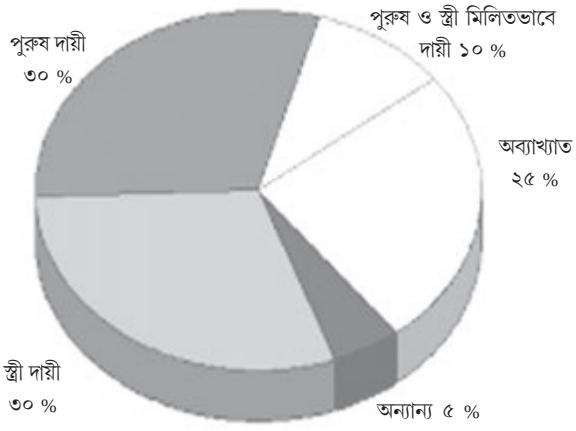

চিত্র ২. বন্ধ্যাত্বের কারণ

প্রেগন্যান্সির তিন মাসের মাথায় পরীক্ষা করে বলা সম্ভব গর্ভস্থ সন্তানের থ্যালাসেমিয়া রোগ আছে কি নেই। রোগ আছে প্রমাণিত হলে যথাসময়ে গর্ভপাত করিয়ে নেওয়া সম্ভব। অতএব প্রেগন্যান্সি শুরুর আগেই ইচ্ছুক যুগলের একটি সাধারণ রক্তপরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত; যাতে জানা যাবে তাঁরা থ্যালাসেমিয়ার বাহক কি না। এই পরীক্ষাটিও খুব একটা খরচ সাপেক্ষ নয় এবং সরকারি হাসপাতালে এই পরিষেবা পাওয়া সম্ভব।

মায়ের বয়স ও চিকিৎসায় সাফল্যের হার

বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায় সাফল্যের হার নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমেই জানতে হবে এখানে সাফল্যের সংজ্ঞা কী? গর্ভসঞ্চার হলেই কি তাকে সাফল্য বলব? না কি জীবিত সন্তানের জন্ম হলে তবেই সেটাকে সাফল্য বলব? ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের মতো দেশে যেখানে রাষ্ট্রীয় নিয়ামক সংস্থা আছে (যেমন Human Fertilisation and Embryology Authority) তাদের কাছে জীবন্ত শিশু জন্মের হারই (Live birth rate) সাফল্যের হার। ভারতবর্ষে এধরনের কোনো নিয়ামক সংস্থা নেই। ফলে বিভিন্ন ক্লিনিক যে সাফল্যের হার দাবি করে তাতে সামান্য হলেও প্রশ্নচিহ্ন থেকে যায়। ক্লিনিক ভিত্তিক পরিসংখ্যানে না গিয়েও একটা কথা বলাই যায়—আর সেটা হল, মায়ের বয়স যত বাড়ে চিকিৎসায় সাফল্যের হার তত কমে। প্রতিটি নারীর জন্ম হয় একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ডিম্বাণু নিয়ে। এই ডিম্বাণুগুলি যত পুরানো হয় তাদের জননক্ষমতা তত কমে। চিকিৎসায় সাফল্যের হার বিশেষভাবে কমে আসে মায়ের বয়স ৩৫ পেরিয়ে গেলে।

বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা

বন্ধ্যাত্বের কারণ অনুসন্ধান ও তৎপরবর্তী চিকিৎসা দুটোই ভীষণ মানসিক চাপের হতে পারে। আর সেজন্যই সামান্য কিছু ধ্যানধারণা থাকলে আপনাকে কেউ সহজে ভুল পথে চালিত করতে পারবেন না। বিভিন্ন রকম টেস্ট শুরুর আগে আপনার জেনে রাখা উচিত কখন এই ব্যয়সাপেক্ষ এবং সময়-সাপেক্ষ কর্মপদ্ধতিতে আপনি অংশগ্রহণ করবেন। অর্থাৎ আপনারা কি স্বাভাবিকভাবে অন্ততপক্ষে এক বছর চেষ্টা করেছেন? ধরে নিলাম, করেছেন এবং তারপর আপনারা একজন সুচিকিৎসকের কাছে গিয়েছেন। অনেকের ধারণা থাকে, বন্ধ্যাত্বের একমাত্র চিকিৎসা 'আই ভি এফ' (IVF or In vitro Fertilisation)। আসলে তা নয়, একজন সুচিকিৎসক আগে সাধারণ সহজ-সরল চিকিৎসা করে ব্যর্থ হলে তবেই আইভিএফ-এর পরামর্শ দেন। অবশ্য কিছু কিছু রোগ থাকে যেখানে সরাসরি আইভিএফ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। যেমন, দু-দিকেরই ডিম্বনালী বন্ধ থাকা (Bilateral Tubal Block) অথবা শুক্রাণুর বিশেষ কিছু সমস্যা। আইভিএফ করার আগে সাধারণত যে সমস্ত পদ্ধতি চেষ্টা করা হয় সেগুলি হল Ovulation Induction (OI), Intrauterine Insemination (IUI) ইত্যাদি। এগুলোর বাংলা প্রতিশব্দ নেই, সুতরাং ইংরেজি শব্দ ছাড়া গতি নেই। 'OI' পদ্ধতিতে রোগিণীকে কিছু ট্যাবলেট বা ইঞ্জেকশন দিয়ে ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু নিঃসরণে সাহায্য করা হয়। এতে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা পাঁচ থেকে দশ শতাংশ বাড়ে। এর পর ইচ্ছুক পিতার বা অজানা কোনো সুস্থ দাতার শুক্রাণু জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করলে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা আরও কিছুটা বাড়ে (সব মিলিয়ে ২০%)। এই পদ্ধতিকে 'IUI' বলা হয়। চিকিৎসার জটিলতা যত বাড়ে তার খরচও তত বাড়তে থাকে।

মায়ের বয়স যত বাড়ে চিকিৎসায় সাফল্যের হার তত কমে।

সবশেষে আসি আই ভি এফ প্রসঙ্গে। ঠিক কী কারণে একে টেস্ট টিউব বেবি বলা হয় জানা নেই। এই পদ্ধতিতে প্রথমে ডিম্বাণুদাত্রী নারীর শরীরে কিছু ওষুধ প্রয়োগ করে অনেকগুলো ডিম্বাণু এক সঙ্গে পরিপক্ব অবস্থায় আনা হয়। সেই ডিম্বাণুগুলি এরপর নারীর শরীরের বাইরে আনা হয় ও পুরুষের শুক্রাণুর সঙ্গে মেলানো হয়। ফলে তৈরি হয় ভ্রূণের প্রথম কোষ বা জাইগোট। অবশ্য ব্যাপারটা যেমন বললাম, ডিম্বাণু-শুক্রাণু মিলিয়ে দিলেই যেন কার্যকর জাইগোট তৈরি হয়ে গেল, তেমন সোজা নয়। কিন্তু টেকনিক্যাল ডিটেলে না গিয়ে, ব্যাপারটার মূল পদ্ধতিটা এই রকমই। এর নির্দিষ্ট সময় পরে ভ্রূণটা ইচ্ছুক নারীর গর্ভে প্রতিস্থাপন করা হয়। মাতৃত্বে ইচ্ছুক কিন্তু গর্ভধারণে অপারগ অথবা অনিচ্ছুক হলে সেই ভ্রূণ অন্য কোনো নারীর গর্ভে দেওয়া হয়। এই গর্ভদানকারী নারীকেই সারোগেট বলা হয়। আই ভি এফ পদ্ধতিতে 'সারোগেট মা' দরকার বা পছন্দ হতে পারেন, কিন্তু সন্তান পেতে ইচ্ছুক যুগলের নারী বা 'মা' নিজেই আইভিএফ -এর পর গর্ভধারণ করবেন, এটাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়।

আইভিএফ পদ্ধতিতে ডিম্বাণু এবং শুক্রাণুকে যদিও শরীরের বাইরে এক জায়গায় মিশিয়ে দেওয়া হয় তা সত্ত্বেও অনেকসময় ডিম্বাণুর নিষেক হয়ে ওঠে না। এর একটা বড়ো কারণ শুক্রাণুগুলির স্বাভাবিক নড়াচড়া করার ক্ষমতা হ্রাস (Lack of mobility)। এই বিশেষ ক্ষমতাটি না থাকলে

ডিম্বাণুর কোষ-প্রাচীর (cell wall) ভেদ করে শুক্রাণু তার ভিতর ঢুকতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে যে চিকিৎসার সাহায্য নেওয়া হয় তাকে বলা হয় ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection বা 'ইক্সি')। এই পদ্ধতিতে শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপের তলায় একটি ডিম্বাণুর ভিতর একটি মাত্র শুক্রাণু 'ইনজেক্ট' করে দেওয়া হয়। আইভিএফ বা 'ইকসি' চিকিৎসায় সাফল্যের হার গড়পড়তা ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতি তিনজন ইচ্ছুক দম্পতির মধ্যে দু-জনের ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা ব্যর্থ হয়।

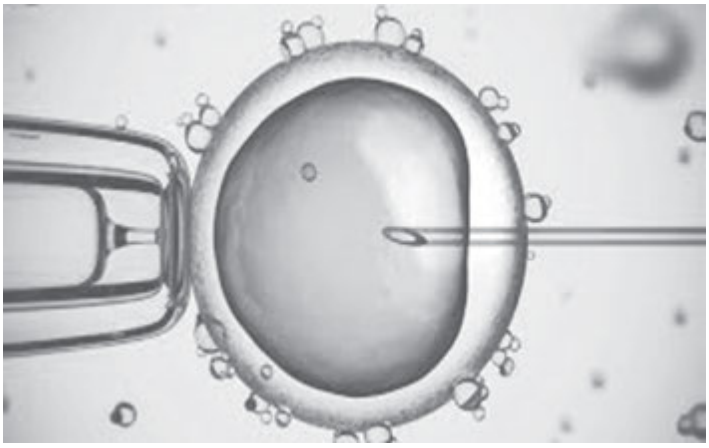

চিত্র ৩. ইন্ট্রাসাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইঞ্জেকশন বা ইকসি (ICSI)

আইভিএফ এবং 'ইকসি' পদ্ধতিগুলি অবশ্যই জটিল এবং প্রযুক্তিনির্ভর। স্বাভাবিকভাবেই এদের খরচও সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। কিন্তু সন্তানলাভের উদ্দেশ্যে মানুষ যেকোনো উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করতে প্রস্তুত থাকেন। আর এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। প্রয়োজন না থাকলেও অথবা অন্যান্য সহজ সরল পদ্ধতির প্রয়োগ না করেই তাঁরা IVF দাওয়াই বাতলে দেন। তবে অধিকাংশ চিকিৎসকই এখনও রীতিনীতি মেনে প্র্যাকটিস করেন বলে আমার বিশ্বাস।

পরিশেষে সংক্ষেপে

নিজেকে বন্ধ্যাত্বের শিকার হিসাবে চিহ্নিত করার আগে এর খুঁটিনাটি আগে জেনে নিন। গর্ভধারণের আগে নিজেকে যথাসম্ভব সুস্থ রাখুন। শরীরের আদর্শ ওজন লাভের দিকে নজর দিন। ধূমপান, মদ্যপান ইত্যাদি কুঅভ্যাস ত্যাগ করুন। আপনার জীবনসঙ্গীকেও এসব নেশা বর্জন করতে বলুন। সন্তানধারণের পরিকল্পনা চলার সময় থেকে ফোলিক অ্যাসিড ভিটামিন খেতে শুরু করুন। দু-জনেই থ্যালাসেমিয়ার বাহক কিনা আগে জেনে নিন। বন্ধ্যাত্বের কারণ অনুসন্ধান বা প্রকৃত চিকিৎসা চলাকালীন প্রতি পদক্ষেপ বোঝার চেষ্টা করুন। চিকিৎসককে প্রশ্ন করুন। অন্য কোনো অপশন আছে কি না যাচাই করুন। প্রয়োজন হলে অবশ্যই আইভিএফ করাবেন। তবে তার আগে আপনার সামনে আর কোনো রাস্তা খোলা আছে কি না দেখে নিন। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. কাঞ্চন মুখার্জি, এমবিবিএস, এফ আর সিওজি, ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়), বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন— ১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬।

অথবা ফোন করুন ০৮৪২০০৬৬৫৯৪ অথবা ০৩৩২৫৪৩৭৫৬০।

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

বালবিধবা থেকে মহিলা ডাক্তার

ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে

তৃতীয় পর্ব

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

ডা. হৈমবতী সেন-এর (১৮৬৬-১৯৩৩) দিনলিপি থেকে পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (এপ্রিল-মে, ২০১৬) থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এটি তৃতীয় পর্ব। সংসার-সমাজ-প্রশাসন-সহ প্রায় এক সার্বিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে হৈমবতীর একক-সংগ্রামকে অনুধাবন করতে গেলে তাঁর সময়কাল, পরিপার্শ্ব, সমাজ-সংস্কৃতিকেও খুঁটিয়ে জানতে হয়। সেকারণে দিনলিপি-র অনেক আপাত-সম্পর্কহীন খুঁটিনাটি বিবরণও যথাসম্ভব এ-লেখায় রেখে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

পূর্ব প্রকাশিতের পর

কচি বয়সে

এতক্ষণ পরিবার নিয়ে কথা হল। এবার একটু নিজের কথা হোক। আমি একজন জন্ম-অভাগী। জন্ম থেকেই মা আমার দিকে ফিরেও তাকাতেন না। তাকাবেনই-বা কেন? আমি তো কোনোদিন আর এই বিপুল জমিদারির মালিক হতে পারব না। সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায় ছেলেরা। আমাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন পুঁটি-মা। পরে অবশ্য মা আর অতটা হেলাফেলা করেননি, তবে আমাকে পেয়ে বাবার আনন্দ দেখে কে! মাস জুড়ে বাড়িতে গানবাজনার আসর বসিয়েছিলেন। কচি বয়সে ভিতরমহলে আমি থোড়াই থাকতাম, বাইরমহলেই আমার যত দাপাদাপি। পাঁচ বছর পর্যন্ত আমাক সবাই ডাকত চুনিবাবু বলে, পরতাম ছেলেদের জামাকাপড়।

একবার বাবার সঙ্গে বজরায় চড়ে খুলনা গিয়েছিলাম। বত্রিশ দাঁড়ের বজরা। লেঠেলরা ওই দাঁড় টানত। বাবার সঙ্গে বজরায় থাকত একজন পুরোনো অভিজ্ঞ লেঠেল, চারজন মাঝি, একজন পিয়োন, একজন চাকর আর একজন রাঁধুনি বামুন। কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মোসায়েবের দলও সঙ্গে থাকত। আমিও যেতাম বাবার কোঁচা ধরে। যে দিনটার কথা বলছি, সে দিন দিনভর ঝড়বৃষ্টি। বজরা এগোতেই পারছে না মোটে। সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে দু মাইলও এগোতে পেরেছি কি না সন্দেহ। বাবা বামুনকে বললেন, খিচুড়ি রাঁধো। সব জোগাড়যন্ত্র সেরে বেশ বড়োসড়ো এক হাঁড়ি খিচুরি রান্না হল। কিন্তু লোকজন তো অনেক, এক হাঁড়িতে কুলোবে না। বাবা বললেন, যত ঘি আছে, ঢালো খিচুড়িতে। বজরায় তিন পাউন্ড মতো (প্রায় দেড় কিলোগ্রাম) ঘি মজুত ছিল। আমি অমন খিচুড়ির স্বাদ আর কোনো দিনও পাইনি। কেউ এক আউন্সের (প্রায় উনত্রিশ গ্রাম) বেশি খেতেই পারল না। জিভে জড়িয়ে যাচ্ছিল। ওই এক হাঁড়িতেই অতগুলো লোকের দিব্যি খাওয়া-দাওয়া সারা!

ওই ঝড়জলে বেড়ানোর দফা রফা। রাতেই ফিরে আসতে হল। শেষে এক গাঁয়ের পাশে খালে নোঙর ফেলা গেল। বাবা আমাকে এক আরদালির সঙ্গে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। আলেক সর্দার আমাকে একটা চাদরে মুড়ে কোলে জাপটে নিয়ে বাড়ির পথ ধরল। কিন্তু বিপদ তো একা আসে না। কোন পথে যাবে সে? ঝড়ে মুহুর্মুহু গাছ ভেঙে পড়ছে। পথ বন্ধ। একটা বেল গাছের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চার-পাঁচটা বেল আমার গায়ের উপর পড়তে জোর ব্যথা পেলাম। চিৎকার করে কাঁদতে লাগলাম। আরদালি আমাকে এক কৈবর্তের বাড়িতে নিয়ে গেল। হেলে না জেলে কৈবর্ত আমার ঠিক মনে নেই। তার বড়ো বাড়িটা ঝড়ে ভেঙে চুরমার। তারা পরিবারের সবাই, নিজেরাই পাশের গোয়ালটায় মাথা গুঁজে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। আলেক সর্দার আমাকে নিয়ে ওই গোয়ালেই ঢুকল। আমাকে ওই অবস্থায় দেখে ওদের মধ্যে হাহুতাশ পড়ে গেল; আমাকে খানিকটা দুধ খাইয়ে দিয়ে একটা ভালো তোশকের ওপর শুইয়ে দিল। বাবা আমাকে কেন আরদালির সঙ্গে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন, আমি জানি না। যদি বজরায় থাকতে পেতাম তাহলে তো এত কষ্ট পেতে হত না। আরদালি তার কাজটা ঠিকমতো করে উঠতে পারেনি। যা হোক আমি ওই গোয়ালেই ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন সকালেই ঝড় থেমে গেল। প্রথমে বাড়ি ফিরলেন বাবা, একটু পরেই আলেক সর্দার আমাকে কোলে করে নিয়ে ঢুকল। বেল পড়ে আমার শরীরের যেসব জায়গা কেটে, ছড়ে গিয়েছিল সেগুলো সারতে সময় লাগলো অনেকটা।

বারমহলই আমার সাম্রাজ্য। স্কুল চলার সময় সারাটা দিন আমি স্কুলঘরেই কাটাতাম। মাস্টারমশাই আমাকে খুব ভালোবাসতেন। আমিও খুব মন দিয়ে

ওঁর পড়ানো শুনতাম, দারুণ ভালো লাগত। কিন্তু আমার তো লেখাপড়া করা চলবে না। যদিও আর সবদিক থেকে আমি ছেলেদের মতোই দিন কাটাতাম কিন্তু লেখাপড়ার বেলায় আমি তো একটা মেয়ে। আমাদের দেশে এক বদ্ধমূল অন্ধশ্রদ্ধা ছিল যে মেয়েরা যদি লেখাপড়া শেখে তাহলে তাদের বিধবা হওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না। সেজন্যে ও পথের ছায়াও আমি মাড়াতে পারব না। কিন্তু ভগবান যে আমার মনে লেখাপড়া করার এক উদগ্র বাসনা পুরে দিয়েছেন। আমি মন দিয়ে শুনতাম আর মাস্টারমশাই ছেলেদের যা শেখাতেন তা মনের মণিকোঠায় ভরে রাখতাম। যা শিখেছিলাম তার কিছু কিছু এখনও আমার মনে আছে, বলতেও পারি। প্রাইমারি স্কুলে যা শেখানো হত তার প্রায় সবটাই আমি শিখে নিয়েছিলাম কিন্তু বর্ণমালার একটা বর্ণও আমি চিনতাম না।

তিন বা চার বার কোনো-না-কোনো উপলক্ষে স্কুল পরিদর্শক স্কুলে এসেছিলেন। একবার এক সহকারী স্কুল পরিদর্শক, সারদাবাবু ছেলেদের প্রশ্ন করে তারা কতটা জানে পরখ করছিলেন। ছেলেরা যেগুলো পারছিল না আমি পটাপট সেগুলোর উত্তর দিতে লাগলাম। সারদাবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখন চুপ করো, আমি পরে তোমার পরীক্ষা নেব'। আমি চুপটি করে বসে রইলাম। ছেলেদের পরীক্ষা শেষে তিনি আমায় ডাকলেন। আমি কাছে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী বই পড়ো তুমি?' আমি জবাব দিলাম, 'আমি তো পড়তে পারি না।' 'তা হলে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিলে কী করে?' আমি বললাম, 'আমি সবই শুনে শুনে শিখেছি'। 'তিনি আমার চোখের সামনে প্রাথমিকের একটা বই মেলে ধরলেন। ওই বইয়ের একটা অক্ষরও আমি চিনি না। তিনি বললেন, 'তুমি শুনে শুনে মনে রেখে কী শিখেছ, আমাকে বলো।' আমি কবিতা-অংশে ছানার মিষ্টির উপর একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনালাম। কবিতাটার শুরু এইরকম, 'আমি সুন্দর মুখ চাই না।' তারপর চরিতাবলি থেকে ভুবনের গল্পটা আর কবিতা কুসুমাঞ্জলি থেকে বেশ কয়েকটা কবিতা বললাম। ইন্সপেক্টর তো মহা খুশি; বললেন, 'লেখাপড়া করো না কেন?' আমি বললাম, 'তা করলে তো বিধবা হয়ে যাব।' তিনি হা হা করে হেসে উঠলেন, বললেন, 'তাই যদি হয় তবে তাই হোক। তোমার এত বুদ্ধি, এতে তো মরচে ধরানো যায় না।' তিনি আমাকে প্রাথমিকের প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের একটা করে বই দিলেন, তারপর আমার বাবার সঙ্গে দেখা করলেন। বাবার সামনে আমার বুদ্ধির খুব প্রশংসা করে বাবাকে অনুরোধ করলেন আমার স্কুলে যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে। বাবা বললেন, 'আমার তো কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আমার পরিবারের মেয়েদের এই বিষয়ে ঘোর আপত্তি।' ইন্সপেক্টর বললেন, 'এই মেয়েকে যদি লেখাপড়া শেখানো হয় তাহলে এটা একটা অকল্পনীয় ব্যাপার হবে।' বাবা বললেন, 'বেশ তাই হোক। বাড়ির মেয়েদের এ নিয়ে কিছু না জানালেই হবে।' আমার ফুর্তি দেখে কে! তক্ষুনি ছুটে মাস্টারমশাইয়ের কাছে গেলাম, বললাম, 'আমাকে পড়ান।' তিনি আমার হাতে খড়ি দিয়ে লেখাপড়া শুরু করে দিলেন। আমি একপ্রাণ হয়ে পড়াশোনা করতাম, মাস্টারমশাইয়ের কাছে শিখতাম। আমার পড়াশোনার ঠেলায় মাস্টারমশাই অন্যান্য ছাত্রদের পড়ানোর ফুরসতই পেতেন না। নাজেহাল হয়ে তিনি আমাকে একদিন সাবধান করে দিলেন, 'তোমার লেখাপড়া যদি এরকম ঘোড়ার মতন ছুটতে থাকে তাহলে সরস্বতী কিন্তু তোমার উপর খুব রেগে যাবেন। তুমি কিছু শিখতেও পারবে না, জানতেও পারবে না, মূর্খ হয়ে থাকবে।' এই কথা শুনে আমার লেখাপড়া করার গতি খানিকটা কমল ঠিকই কিন্তু আমি থেমে যাইনি মোটেই। যে দু-টি বই পেয়েছিলাম দু-মাসের মধ্যেই তা মুখস্থ করে ফেলেছি। আরও পড়ার জন্য আমি অধীর হয়ে উঠলাম। হাতের কাছে যা পাই তাই পড়ে ফেলি। দেখতে-না-দেখতে শুভঙ্করী মুখস্থ হয়ে গেল। কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে ত্রৈলোক্যখুড়ো আর রামচরণদা-র মতো মহাভারত পড়ি। আমি যদি ঠাকমা-দিদিমাদের সামনে রামায়ণ মহাভারত পড়ে শোনাতে পারি তবেই তো ওঁরা বুঝতে পারবেন আমি কতটা শিখেছি। আমি তাই রামায়ণ থেকে পাতা ছিঁড়ে নিতে লাগলাম আর বনের মাঠে যেখানে আমরা খেলতাম সেখানে বন্ধুদের পড়ে শোনাতে লাগলাম।

একদিন আমি সুর করে মাস্টারমশাইকে রামায়ণ পড়ে শোনালাম। তিনি তো খুব খুশি, বললেন, 'মণি, তুমি তো চমৎকার রামায়ণ পড়তে শিখেছ।' আমি শুধালাম, 'ঠাকমা-দিদিমাদের সামনে আমি এই একইরকম সুরে রামায়ণ-পাঠ করতে পারব? তিনি বললেন, 'স্বচ্ছন্দে'। আমি তো ফুর্তিতে ডগমগ। সেদিনই বিকেলে ঠাকমা-দিদিমারা জড়ো হয়েছেন জ্ঞাতিভাই রামচরণের পাঠ শুনবেন বলে। আমি সটান সেখানে গিয়ে হাজির, বললাম, 'আমি রামায়ণ-পাঠ করব।' তাঁরা সমস্বরে বলে উঠলেন, 'সে কি রে বিদ্যেধরী, তুই পড়বি? কী করে? ঢুঁ মারলেও কি একটা অক্ষর বেরোবে তোর পেট থেকে!' বললাম, 'আমি পড়তে জানি, আমাকে পড়তে দাও, না পারলে তখন বোলো', আমি তখন যেমনভাবে সুর করে রামায়ণ পড়া হয়, অবিকল সেই সুরে পাঠ করতে শুরু করলাম। তাক লেগে গেল সকলের, মুখ হাঁ, বাক্যি সরে না মোটে! তাজ্জব ব্যাপার! যখন অনেকটা পড়া হয়ে গেছে, রামচরণদা আসরে হাজির। সব দেখলেন শুনলেন। আমাকে প্রশংসার ভরিয়ে দিলেন, বললেন, 'সত্যিই ও চমৎকার পাঠ করে, এবার থেকে ও-ই রামায়ণ পাঠ করবে।'

বেসামাল ধাক্কাটা সামলে নিয়ে একটু থিতু হতেই বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল। এসব ও শিখল কোত্থেকে, কী করে? সকলে মিলে হায় হায় করতে লাগল, এরপর ওর কী হবে? ওঁরা মা-কে ডেকে পাঠালেন, বললেন, 'দেখো গিয়ে তোমার বেহায়া মেয়ের কীর্তি! ও নির্ঘাত বিধবা হবে। এমন বিদ্যেধরী ঘরে থাকলে জাত তো তোমার যাবেই। তোমার আশকারায় ও সারাটা দিন বারমহলে টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। এখন তো আস্ত একটা মরদানা-মেয়ে হয়ে উঠেছে। নিজেকে একজন কেউকেটা ভাবছে। এসব শুনে ওঁদের রামায়ণ-পাঠ করে শোনানোর সব উৎসাহ আমার নিভে জল হয়ে গেল। এমন নিদারুণ 'বাহবা' পেলে, অন্য কেউ হলে হয়তো জীবনে আর বই ছুঁতই না। কিন্তু আমি যে একটু অন্য ধাতুতে গড়া, অত সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নই। বাড়ির ভেতর বই পড়া বন্ধ। পরোয়া নেই। গাঁয়ের কোনো একটা মহল্লায় চলে যেতাম, সারাটা বিকেল ধরে গোগ্রাসে পড়তাম---রামায়ণ, মহাভারত কালিকাপুরাণ, গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী, ভক্তিরসামৃত এমন আরও অনেক বই। এত মন দিয়ে পড়ি দেখে অনেকেই আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন। মনে জোর পেলাম, ফের যেন চাঙা হয়ে উঠলাম। এই সময়ে আবার ইন্সপেক্টর এলেন, তিনি আমার পড়া ধরতে লাগলেন। আমার পড়া দেওয়ায় তাঁর মন ভরে গল। পুরস্কার দেওয়ার দিন

তিনি আমাকে দুটো বই, একটা ফুলছাঁদের রুপোর কাঁটা, একটা চিরুনি আর একটা আরশি দিলেন। ফিরে যাওয়ার সময়ে বললেন, 'এই মেয়েটির মগজটা খুব সাফ, ঠিকমতো লেখাপড়া করলে ও একদিন 'মহীয়সী নারী' হয়ে উঠতে পারে। আফশোসের কথা ওকে তো সে-সুযোগটা কেউ কোনোদিন দেবে না।'

পুরস্কার পাওয়াতেই আমার কপালটা ভাঙল। দিকে দিকে রটে গেল আমি বেহায়া, ধিঙ্গি, মরদানার মতো চালচলন। 'ও বাড়ি বয়ে পুরস্কার নিয়ে এসেছে, এখন কে ওকে বিয়ে করবে! লোকে যদি জানতে পারে, ওর গায়ের কালি কি কোনোদিন ঘুচবে? এমন অঢেল 'সদাশয় সাবাশি'ও কিন্তু আমার উৎসাহকে একফোঁটাও দমাতে পারেনি। ভাবলাম কাউকে যদি শেখানো যায় তবে চর্চাটা থাকে। কাকে পাই, কে আমায় সাথ দেবে? এর মধ্যে আমি স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। যথেষ্ট পড়তে শিখে গেছি, রামায়ণ মহাভারত-এর মতো মোটা মোটা বই পড়তে পারি। এখন মনমতো একটা শাগরেদ জোটানো দরকার। বাছি কাকে? এই সময়টাতেই ছোটো খুড়িমা প্রথমবার শ্বশুরবাড়িতে পাকাপাকি থাকতে এলেন। তিনি আমার কাকার দ্বিতীয় বউ। যখন প্রথম এলেন তাঁর বয়স তেরো, আমার আট। সর্বক্ষণ আমি তাঁর পায়ে পায়ে ঘুরি, আমি ছাড়া কথা বলার মতো তাঁর আছেটাই-বা কে? আমরা খেতাম, চান করতাম, শুতে যেতাম—এককথায় সবকিছুই করতাম জোড় বেঁধে। এই খুড়িমা আসার পর থেকে আমি বারমহলে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছিলাম প্রায়। এমন লক্ষ্মী মেয়ে, যা বলতাম, সব সোনামুখ করে মেনে নিত। আমার তো আনন্দ আর ধরে না। আমি শিশুশিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ আর আমার অন্য সব বই-ই ওকে পড়তে দিলাম। একদিন দেখি, ও আমার দিকে চোখ বড়ো বড়ো করে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। বলি, কী হল, অমন হাঁ করে কী দেখছ? ও বলল, একরত্তি এক মেয়ে তুমি, ওই ঢাউস ঢাউস রামায়ণ মহাভারত গোটাটা পড়ে ফেল, আর আমি হাঁ হয়ে যাব না! আমি ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললাম, একদিন ঠিক তোমাকে পড়ে শোনাব। খুড়িমা খুব খুশি হয়ে বলল, আমি তোমার কাছেই পড়ব। চুপিচুপি, কেউ জানতে পারবে না। বিকেলে আমি ওকে শিশুশিক্ষার প্রথম ভাগ পড়াতে শুরু করলাম। কিন্তু বাবার কাছে ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখা গেল না। তাঁকে বললাম, আমি রোজ খুড়িমাকে পড়াই। বাবা বললেন, হু! মতলবটা তো এঁটেছ দারুণ! তুমি তো দেখছি, বেচারা মেয়েটাকে বেদম পিটুনি খাইয়ে প্রাণে মারবার জোগাড় করেছ! কেউ যদি একবার টের পায়, তোমাদের দুটোকেই মেরে হাড়গোড় আর আস্ত রাখবে না। আমরা রান্নাঘরের পাশে ছোট্ট একটা নিরালা ঘরে বসতাম। ওই ঘরে বাড়ির নতুন কনেদের মজলিশ বসত—ওরা তাসপাশা খেলত, নয়তো রান্নাঘরে খাবার-দাবার ঝুলিয়ে রাখার জন্য যে শিকে থাকে, দড়ি দিয়ে সেই শিকে বুনত কিংবা কাঁথা সেলাই করত। ওই সময়টাতে খুড়িমা ছাড়া বাড়িতে আর কোনো নতুন বউ নেই। খুড়িমা আর পাড়ার কচিকাঁচা মেয়ের দলই ঘরটাতে যেত। আমি কিন্তু কোনো-না-কোনো অছিলায় মেয়েগুলোকে ওই ঘরে ঢুকতে দিতাম না। আমি তো খুড়িমাকে পড়াব, কেউ টের পেলেই বিপদ; সেজন্য ওদের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাঁধিয়ে নয়তো মেরেধরে ঘর থেকে বার করে দিতাম। এরকম চলছিল বেশ কিছুদিন, কিন্তু অচিরেই আমার লেখাপড়ার পাট গেল চুকে।

বাড়ির সবাই আমার বিয়ের জন্য উঠেপড়ে লাগল। দুই ঠাকুমা ঘটক ডেকে পাঠালেন, বললেন, সুপাত্রের খোঁজ করতে। আমাকে গৌরীদান* করতে পারলে তো ওঁদের অনেক পুণ্য হয়। ক-দিন বাদেই ঘটকঠাকুর আগাম রাহাখরচ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পাত্রের খোঁজে। দিন পনেরো বাদে ফিরে এলেন বেশ কয়েকটি পাত্রের সুলুকসন্ধান নিয়ে। ওরা সকলেই কুলীন ঘরের। পাত্রের খবর এল শ্রীধরপুর, শোভনা, নড়াইল, খেজুড়া এমন আরও অনেক জায়গা থেকে। তাদের বয়স চব্বিশ, পঁচিশ, ছাব্বিশ, তিরিশ . . . বয়স বেড়েই চলেছে। তাদের কাউকেই বাবার পছন্দ হল না। সব ক-টা এক একটা গণ্ডমূর্খ—লেখাপড়ার ধারকাছ মাড়ায় না। এরপর ফের খোঁজখবর শুরু হল। শ্যাম আর রায়কাঠির রাজা, বনগ্রামের জমিদার—এঁরা এসে সব দেখলেন, শুনলেন, জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তাঁদের সকলের মুখে এক কথা—লেখাপড়া শিখে এ মেয়ে তো একেবারে বয়ে গেছে! এর সঙ্গে টক্কর দিয়ে একে মানিয়ে নেওয়া আমাদের কম্ম নয়। সব খবর পৌঁছে গেল অন্দরমহলে—তারা সব মুখিয়ে রইলেন, আমাকে উচিতমতো 'স্বাগত' জানাতে। তাঁরা তো গোড়া থেকেই জানতেন—যে মেয়ে এত এত পুরস্কার পেয়েছে, তার তো খেরেস্তান হওয়া ছাড়া অন্য কোনো গতি নেই। তাঁরা বললেন, 'ওকে তো এবার খেরেস্তান গঙ্গবাবুর ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।' এসব শুনে আমার মাথায় আগুন ধরে গেল। এসব চোখা চোখা বাক্যবাণ আমি দিনের পর দিন শুনে এসেছি; ওসব কথায় আমি কানও দিইনি, মাথাও ঘামাইনি, ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছি। আমার সমস্ত ক্ষমতা উজাড় করে খুড়িমাকে পড়িয়ে গিয়েছি। তারও শিশুশিক্ষা-প্রথম ভাগ পড়া শেষ। এখন সে অন্যান্য বইও পড়তে পারছে। এখন ওকে লেখা শেখাই কী করে? আমি মাস্টারমশাইয়ের থেকে কয়েকটা শরের কলম পেয়েছিলাম, আর ভাতের হাঁড়ির তলি চেঁছে কিছুটা ভুসো জোগাড় করলাম। ভাত ভেজে ভেজে ভুসিকালো করে পোড়ালাম, সেটা জলে গুলে একটা মাটির ভাঁড়ে রাখলাম। এই হল আমার কালি। এই কালি দিয়ে কলার পাতার ওপর লিখতাম। ছাপা-বইতে যা দেখতাম, নকল করে লিখতাম; নকল করে লেখার জন্য অন্য বইয়ের পাতাও ছিঁড়ে নিতাম।

এর মধ্যে বিয়ের একটা নতুন সম্বন্ধ এল। পাত্র যশোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তার ভাই খুলনায় পুলিশ ইন্সপেক্টর। হবু বর জাতে কুলীন কায়স্থ, বয়স পঁয়তাল্লিশ। তার দু বউ মরেছে; এখন সে তিন নম্বর বিয়ের তোড়জোড় চালাচ্ছে। তার প্রথম পক্ষের দু মেয়ে বেঁচে আছে। দ্বিতীয় পক্ষের মা-ছেলে মারা গেছে একসঙ্গে। প্রথম পক্ষের আরও দু-টি সন্তান মারা গেছে। এ হেন ছেলেকেই সকলের পছন্দ হল! বাবা একটু পা ঘষছিলেন ঠিকই—ছেলের বয়সটা বড্ড বেশি। কিন্তু ঠাকুমাদের কড়া ধমকে তাঁর আপত্তি হাওয়ায় উড়ে গেল। তাঁদের মুখে এক কথা—বর-কনের বয়সের তফাত আবার কী! ওতে কিচ্ছুটি হয় না। বিয়ের জল গায়ে পড়লেই মেয়ে কেমন শাঁসেজলে ফুলেফেঁপে ডাগরডোগর চাঁদপানাটি হয়ে উঠবে দেখো। তার উপর ছেলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বলে কথা! দু ভাই পুলিশ ইন্সপেক্টর। পাকা দালানবাড়ি—বাড়িতে দুর্গোৎসব করার মতো যথেষ্ট ধনী। আমাদের জন্য এই পরিবার আর ছেলে একেবারে উপযুক্ত ঘর; রাজযোটক বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। এই ছেলের সঙ্গেই বিয়ের কথা পাকা করতে হবে। এই ছেলেকে মেনে না নিলে ওর কপালে আর বর জুটবে না। বাবা আর

ওজর-আপত্তি না তুলে ছেলের বাড়ি লোক পাঠালেন। তারা এসে বলল, ছেলে একেবারে কন্দর্পকান্তি! মায়ের তরফেও কোনো আপত্তি আর রইল না। সকলে মিলে আমার বিয়ের উৎসবের বন্দোবস্ত করতে উঠে পড়ে লাগলেন। তখন আমার বয়স সাড়ে ন-বছর।

শ্রাবণ মাসে চাঁদপানা-মুখ বরের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের সময়ে আমি ঘুমিয়ে কাদা। ঘুম ভেঙে উঠে দেখলাম, বড়ো ঠাকুরমার বদলে বিছানায় একটা অচেনা লোক শুয়ে। সাবেককালের পালঙ্কের বিছানা—প্রায় ছত্রিশ ইঞ্চি উঁচু সিঁড়ি বেয়ে বিছানায় উঠতে হত। আমি দেখলাম কেউ একজন সিঁড়িটা সরিয়ে নিয়ে গেছে, ভাবলাম, হায় ভগবান! এখন আমি বিছানা থেকে নামব কী করে? দিলাম শেষে এক লাফ। গা-ভরা গয়না সব রুনঝুন করে বেজে উঠল। বাড়ির সকলে উঠল জেগে—বুঝল কী ঘটেছে, অবাকও হল বই কী। এ যে দেখি শঙ্খিনী** কন্যা! এমন অলক্ষুণে ঘটনা কেউ কখনো দেখেছে না শুনেছে! আমি বললাম, আমার খিদে পেয়েছে। মা শুনে বললেন, আহা রে, বেচারা! সারাদিন কিছু পেটে পড়েনি; ওকে আর তোমরা গঞ্জনা দিয়ো না তো বাপু। আমি খেতে বসলাম প্রত্যুষে; যখন দিনের আলো ফুটে উঠল, তখনও আমার খাওয়া শেষ হয়নি। ওই সকালেই 'একঘেয়ে পানসে বিয়ে'টার যত আচার-অনুষ্ঠান! মা বললেন, চটজলদি খেয়ে নাও। আমি গোগ্রাসে খাওয়া শেষ করতে লাগলাম। আমার গা-ভরা ভারী গয়না, ভারী বেনারসিতে জড়িয়ে-মরিয়ে একটা জড় পুটলির মতো জবুথবু হয়ে রইলাম। উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তায় আমার ভেতরে তখন তুমুল তোলপাড় চলছে। কী যে হচ্ছিল, তার কিছুই এখন আমার মনে নেই। একটা ভাবনাই ঘুরপাক খাচ্ছিল মনে—আমাদের পুতুলের বিয়েতে তো কনেকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হয়; আমার বেলায়ও মনে হয় সেরকমটাই ঘটবে। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছে আমার একেবারেই নেই। বাবার সঙ্গে যে করেই হোক কথা বলতে হবে, না হলে ওরা জোর করে আমাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবে। আমি বাবাকে পাগলের মতো আঁতিপাতি করে খুঁজতে লাগলাম; কিন্তু কোথায় বাবা? মরিয়া হয়ে বারমহলের দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছি—চারপাশের লোকজন হাঁ হাঁ করে উঠল, এ কী অনাছিষ্টি কাণ্ড! আমি ভয়ে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম; নড়নচড়ন নেই। আমি তো বাবার কাছেই যাচ্ছি; এতে কোন মহাভারতটা অশুদ্ধ হল? তখন কয়েকজন মিলে আমাকে বোঝাতে লাগলেন, 'এখন তো তুমি কনে, তোমার এখন বারমহলে যাওয়া সাজে না। বারমহল এখন বরযাত্রীতে গিসগিস করছে। তুমি ওদের বাড়ির কনে, ওদের কাছে গিয়ে তোমার মুখ দেখানো অশোভন।' আমি শুধু বলতে পারলাম, চাই না ওদের বাড়ির কনে-বউ হতে! ওরা আমাকে ধরে পাঁজাকোলা করে ঘরে নিয়ে গেলেন—কিছুতেই বাবার কাছে যেতে দিলেন না। কী করব আমি? মনের মধ্যে ঝড় বইলেও বাইরে শান্ত সংযত রইলাম। চোখের জল বাঁধ মানল না। বসে বসে ফোঁপাতে শুরু করলাম। মনে হতে লাগল, আমার শৈশবের বুঝি-বা এখানেই ইতি। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

* সাধারণত ঋতুমতী হওয়ার পূর্বে মেয়ের বিয়ে দেওয়া। আদর্শ বয়স আট।

** প্রাচীন ঐতিহ্যে চার ধরনের কন্যার বিবরণ আছে। তার একটি শঙ্খিনী। লেখিকার পরিবারে হয়তো এই ধরনের সঙ্গে কোনো অশুভ ইঙ্গিত জড়িয়ে ছিল।

লেখক প্রাবন্ধিক, গ্রন্থ সম্পাদক ও অভিধানকার

Advt.

মিডিয়া কবলমুক্ত, তথ্যনিষ্ঠ বিশ্ব-বিশ্লেষণের ত্রৈমাসিক সম্ভার

বাংলা মান্থলি রিভিয়ু

স্বাধীন মার্কসবাদ-চর্চার অনন্য পত্রিকা

যোগাযোগ: বই-চিত্র, কলেজস্ট্রিট, কফি হাউস,
কলকাতা ৭০০০৭৩

মুঠোফোন: ৯৪৭৭৪৩৩৩৫২
৯৮৩০৮৪৭১৫৯

স্কিন গ্রাফটিং

ডা. সৌম্যকান্তি বাগ

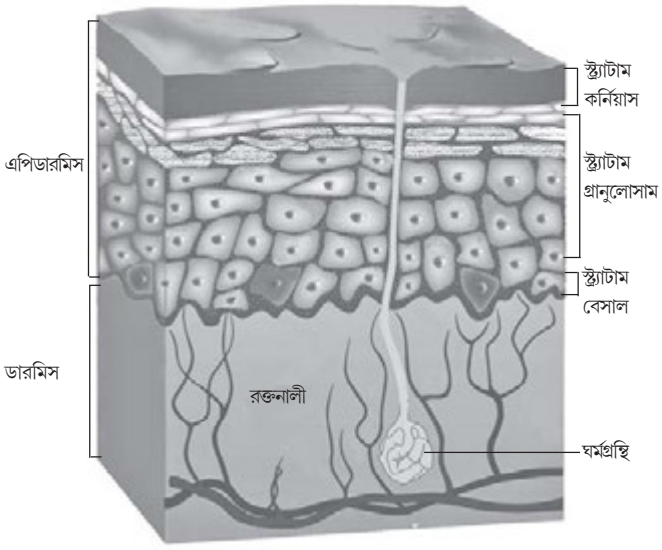

চিত্র ১. ত্বকের গঠন

সুজাতা বাড়ির পাঁচিলের ধার ঘেঁষে হাঁটছিল। হঠাৎ পাড়ার দুটো কুকুর মারামারি করতে করতে এসে পড়ল পায়ের কাছে। পা সামলাতে গিয়ে হোঁচট—আর পড়বি পড় একেবারে পাঁচিলের উপরের কাচের ওপর। বাঁ হাতের তর্জনীর চামড়া বেশ গভীর হয়ে কেটে গেল। স্থানীয় হাসপাতালে সেলাই দেওয়ার পরও ক্ষত শুকোয় না। সার্জেনকে দেখাতে তিনি বললেন—চামড়ার অবস্থা ভালো নয়। তাই অপারেশন করে নষ্ট হওয়া চামড়াটা বাদ দিতে হল। এবার? ক্ষত তো ভরাট হচ্ছে না। ডাক্তার বললেন, এর চিকিৎসা হল 'স্কিন গ্রাফটিং' (Skin grafting)। সেটা আবার কী? কী আবার, এক জায়গার চামড়া কেটে অন্য জায়গায় বসানো—ইধার কা মাল উধার।

'স্কিন গ্রাফট্' (Skin graft) কী?

স্কিন অর্থাৎ চামড়া, আর গ্রাফট্ (graft) অর্থাৎ প্রতিস্থাপন। কিডনি, লিভার ইত্যাদি অংশের মতো চামড়াও এমন একটি অঙ্গ যা প্রতিস্থাপনযোগ্য। যেকোনো অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে নিজ দেহের মধ্যেই অঙ্গ প্রতিস্থাপিত হলে তাকে বলে অটোগ্রাফট্ (autograft)। একই প্রজাতির (অর্থাৎ মানুষের) অন্য কোনো জীবদেহ থেকে অঙ্গটি প্রতিস্থাপিত হলে তাকে বলা হয় অ্যালোগ্রাফট্ (allograft) আর অন্য প্রজাতির জীব থেকে অঙ্গ সংগৃহীত হলে তাকে বলা হয় জেনোগ্রাফট্ (xenograft)। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্কিন গ্রাফট্ হয় অটোগ্রাফট্ (autograft)। অর্থাৎ একই মানুষের দেহের এক অংশ থেকে ত্বক বা ত্বকের অংশ বিশেষ দেহের অন্যত্র প্রতিস্থাপিত করা। তবে অন্য মানুষ, মৃতদেহ বা অন্য প্রাণীর চামড়া প্রতিস্থাপনও কখনো কখনো করা হয়। সেকথায় পরে আসা যাবে।

ত্বকের গঠন

আলোচনা শুরুর আগে ত্বকের গঠন নিয়ে দু-চার কথা বলা যাক। ত্বকে মুলত দু-টি স্তর থাকে।

১. **এপিডারমিস (epidermis)** : চামড়ার বাইরের দিকের অপেক্ষাকৃত পাতলা স্তর, যাতে আবার তিনটি স্তর থাকে—বাইরের দিকে স্ট্র্যাটাম কর্নিয়াম (stratum cornum) ও ভিতরের দিকে স্ট্র্যাটাম গ্রানুলোসাম (stratum granulosum) ও স্ট্রাটাম বেসাল এপিডারমিস মূলত গঠিত হয় কেরাটিনোসাইট নামক (keratinosyte) কোষ দিয়ে যা বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ত্বকের উপরিভাগে আসতে থাকে। এই অংশে মেলানোসাইট (melanosyte) কোষও থাকে যা বর্ণনির্ধারক ও আমাদের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে বাঁচায়।

২. **ডারমিস (dermis)**: চামড়ার ভিতরের দিকের স্তর যার মূলত উপাদান 'কোলাজেন' নামক (collagen) এক ধরনের তন্তু। ত্বকের এই অংশটি সংকোচন-প্রসারণশীল এবং সমস্ত রকম চোট, আঘাত থেকে রক্ষার জন্য দায়ী। এই অংশেই থাকে ত্বকের কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাঙ্গ বিশেষের মূল অংশ যথা ঘর্মগ্রন্থি, চুল এবং সিবেসিয়াস গ্রন্থি। ত্বকের এই উপাঙ্গগুলিই ত্বকের পুনর্গঠনের কাজে মূল ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই যে অংশ থেকে স্কিন গ্রাফটিং করা হয় সেই জায়গায় যেন ডারমিস-এর কিছু অংশ অন্তত থাকে তা অবশ্যই নজর রাখতে হয়।

কয় রকম হয় স্কিন গ্রাফট্?

ত্বকের কতটা অংশ প্রতিস্থাপিত হচ্ছে সেই অনুযায়ী স্কিন গ্রাফট্ মূলত দু-প্রকার—

১. আংশিক (split thickness skin graft–STSG) ২. সম্পূর্ণ (full thickness skin graft–FTSG)। প্রথম প্রকারটিতে সমগ্র এপিডারমিস এবং ডারমিস-এর অংশবিশেষ নেওয়া হয় প্রতিস্থাপিত করার জন্য। অন্যদিকে দ্বিতীয় প্রকারটিতে সমগ্র এপিডারমিস ও ডারমিস গৃহীত হয়।

অবশ্য STSG-এর অনেক প্রকারভেদ আছে যথা—খুব পাতলা (ultrathin), পাতলা (thin) ও মোটা (thick)। মাইক্রোগ্রাফট্, অর্থাৎ যখন STSG-কে খুব ছোটো ছোটো কণার মতো করে প্রতিস্থাপিত করা হয়, তাদের প্রয়োগও বিভিন্ন সেসব এই প্রবন্ধের আলোচনার পরিসরের বাইরে।

কোন রকম গ্রাফট্ ভালো? FTSG না STSG?

দু-রকমেরই কিছু সুবিধা ও অসুবিধা আছে। যেমন—STSG-এর সুবিধা হল এটি যে অংশ থেকে নেওয়া হয় (দাতা অংশ) সে অংশটিতে কিছু সময় পর (সাধারণত ৩ সপ্তাহ) নিজেনিজেই আবার চামড়া গজিয়ে যায়। তাই শরীরের বিস্তীর্ণ এলাকার জন্য একে ব্যবহার করা যায়। অন্যদিকে এর অসুবিধা হল—যে অংশে এটি ব্যবহৃত হয় (গ্রাহক অংশ) সেই অংশে পুনরায় চামড়ায় টান ধরতে পারে (contracture), ফলে দ্বিতীয়বার অপারেশনের প্রয়োজন হতে পারে।

চিত্র ২. স্কিন গ্রাফট্—দাতা (Donor) অঞ্চল

অন্যদিকে FTSG-র সুবিধা হল, এটি সংকোচন-প্রসারণশীল হওয়ায় পরবর্তীকালে টান পরার সমস্যা সাধারণত হয় না। আর FTSG দেখতেও অনেকটাই রোগীর নিজের চামড়ার মতো হওয়ায় STSG-র তুলনায় সুন্দর হয়। কিন্তু FTSG-এর 'দাতা অংশ'-তে কখনোই নিজে থেকে চামড়া গজায় না। হয় সেলাই দিয়ে অথবা অন্য জায়গার থেকে STSG-দ্বারা দাতা অংশ-র ক্ষতটি ভরাট করতে হয়। ফলে বড়ো অংশে FTSG করা যায় না।

শরীরের কোন কোন জায়গা থেকে 'গ্রাফট্' নেওয়া যায়?

STSG শরীরের যে কোনো চ্যাপটালো অংশের ত্বক থেকেই নেওয়া যায়। অর্থাৎ মুখ, তলপেট, বগল ইত্যাদি সমস্ত অসমান অংশ বাদ দিয়ে সমগ্র শরীরের ত্বক থেকেই STSG নেওয়া যায়। তবে দু-পায়ের উরু, পায়ের হাঁটু ও গোড়ালির মাঝের অংশ বাহু, পিঠ, পেট এই অংশগুলিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

অন্যদিকে FTSG নেওয়া হয় শরীরের এমন অংশে যেখানে চামড়ার ভাঁজ থাকে, যেমন—কোমর ও কুঁচকি, গলার কণ্ঠার হাড়ের উপরের অংশ, কানের পিছনের অংশ, কনুইয়ের সামনের অংশ। এই অংশগুলিতে সেলাই দিয়ে চামড়ার ক্ষত বন্ধ করে দেওয়া যায়, তাতে চামড়ার ওপর বেশি টান পড়ে না।

স্কিন গ্রাফট্-এর বিবিধ প্রয়োগ

যেকোনো জায়গায় চামড়ার প্রয়োজন হয় আমাদের শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে ঢাকা দেবার জন্য। ঠিক সেজন্যই সারা শরীরের যেকোনো জায়গায় চামড়া নষ্ট হলে গেলে বা অপারেশন করে বাদ দেবার প্রয়োজন হলে সেখানে 'স্কিন গ্রাফট্' প্রয়োজন হয়। পুড়ে যাওয়া ক্ষত, চোট, আঘাতজনিত কারণে চামড়া নষ্ট হয়ে যাওয়া, ক্যান্সার সার্জারির সময় অপারেশনে চামড়া বাদ যাওয়া, ডায়াবিটিস-এর কারণে চামড়া নষ্ট হওয়া—এইগুলিই হল স্কিন গ্রাফটের মূল প্রয়োগ। এই ক্ষেত্রগুলিতে STSG-ই মূলত ব্যবহৃত হয়। তবে এছাড়া কয়েকটি ক্ষেত্র যেমন জন্মদাগ বা জড়ুল (naevus) ইত্যাদির অপারেশনে বাদ দেওয়া চামড়ার জায়গায় FTSG-ও ব্যবহৃত হয়। মুখের ক্ষত যেখানে সমপরিমাণ চামড়ার প্রয়োজন সেখানেই FTSG ব্যবহৃত হয়।

'স্কিন গ্রাফটিং (Skin grafting)-এর পদ্ধতি

বিশেষ এক ধরনের ছুরি—যার নাম হাম্বিস নাইফ (Humby's Knife) দিয়ে STSG করা হয়। অন্যদিকে সাধারণ সার্জিক্যাল ছুরি দিয়ে FTSG নেওয়া হয়। স্কিন গ্রাফট্ যে অংশে বসানো হবে তার উপর গ্রাফট্ বসিয়ে সেলাই করে আটকে দেওয়া হয়।

অপারেশনের পরবর্তী অন্তত ৫ দিন (FTSG-র ক্ষেত্রে ১০ দিন) স্কিন গ্রাফট্ ক্ষতের উপর লেগে থাকা অত্যন্ত জরুরি। তাই গ্রাফটের উপর প্যারাফিন গজ চাপিয়ে তার উপর ভিজে তুলো রাখা হয়, যাতে গ্রাফটের

অপারেশনের আগে ও পরে পুষ্টিকর খাওয়া-দাওয়া অত্যন্ত জরুরি। অপারেশনের পর ঘা শুকিয়ে আসার পর অন্তত ৩ মাস গ্রাফটিং হওয়া জায়গায় প্যারাফিন বা নারকেল তেল দিয়ে নরম রাখা অত্যন্ত জরুরি।

তলায় জমে থাকা রক্তরস তুলোয় শোষিত হয়। তাই STSG-এর পর ৫ দিন ও FTSG-এর পর ১০ দিন ড্রেসিং অটুট রাখাটা অত্যন্ত জরুরি। STSG-এর ক্ষেত্রে যে অংশ থেকে চামড়া তোলা হয় সেই জায়গাতে ড্রেসিং করে রাখা হয় এবং এই ড্রেসিং সাধারণত তিন সপ্তাহ একইভাবে রাখা হয়। সেই সময়ে সেই দাতা অংশে নতুন চামড়া গজিয়ে যায়। FTSG-র ক্ষেত্রে অবশ্য 'দাতা অংশ'-তে সেলাই করে বন্ধ করে দেওয়া হয়, কখনো বা অন্য কোনো জায়গা থেকে STSG করে পাতলা গ্রাফট্ও বসানো হয়।

অপারেশনের পরে: কী করবেন আর কী করবেন না?

- অপারেশনের আগে ও পরে পুষ্টিকর খাওয়া কতটা অত্যন্ত জরুরি।
- অপারেশনের পর ঘা শুকিয়ে আসার পর অন্তত ৩ মাস গ্রাফটিং হওয়া জায়গায় প্যারাফিন বা নারিকেল তেল দিয়ে নরম রাখা অত্যন্ত জরুরি।

ঘা শুকিয়ে যাবার পর হাত পায়ের সমস্ত রকম ব্যায়াম ও ফিজিয়োথেরাপি খুব গুরুত্বপূর্ণ—না হলে চামড়ার টান (contracture) হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

কয়েকটি জরুরি প্রশ্ন

১. গ্রাফট্ করা চামড়ায় কি চুল গজায় বা ঘন হয়?

FTSG-র ক্ষেত্রে কয়েক মাস পর থেকে চুল গজায় ও ঘন ও হয় কারণ এক্ষেত্রে চুলের গোড়া ও ঘর্মগ্রন্থিগুলি গ্রাফট্-এর সঙ্গে প্রতিস্থাপিত হয়।

২. গ্রাফট্ করা চামড়ায় কি সাড় পাওয়া যায়?

FTSG-র ক্ষেত্রে ২-৩ মাস পর থেকে চামড়ায় সাড় পাওয়া যায়। STSG-র

ক্ষেত্রে ১ বছর পর থেকে সাড় পাওয়া যায়। তবে সাধারণত স্বাভাবিক সাড় পাওয়া যায় না, কিছুটা অস্বাভাবিক সাড় বা ব্যথা থাকাটা স্বাভাবিক।

৩. যতটা স্কিন গ্রাফট্ করা হয় তার পুরোটাই কি কাজে লাগে?

সাধারণত ৭০%-এর বেশি চামড়া ঠিকমতো লেগে গেলে (graft take) তা যথেষ্ট বলে ধরা হয়। তবে পুরো প্রতিস্থাপিত চামড়া না লাগলেও চামড়ার সঙ্গে হওয়া গ্রোথ ফ্যাক্টরগুলির কারণে বহু ক্ষেত্রেই বাকি ক্ষতটিও নিজে নিজেই শুকিয়ে যায়।

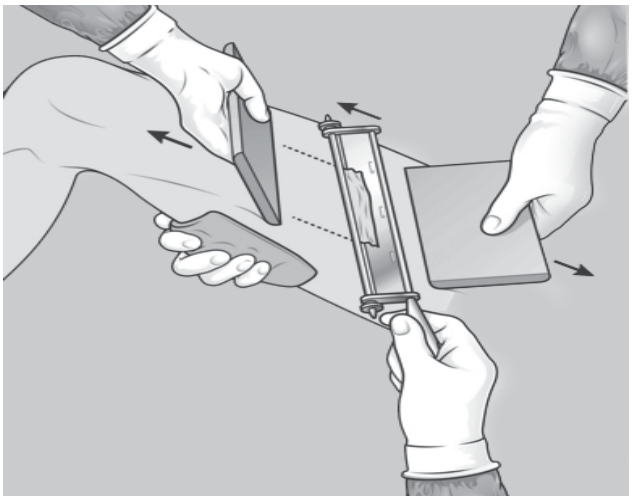

চিত্র ৩. আংশিক (Split thickness) স্কিন গ্রাফটিং-এর রেখাচিত্র

৪. গ্রাফটিং না করে মলম দিয়ে ভালো করা যায় না?

ড্রেসিং করতে থাকলে বেশিরভাগ ক্ষতই একসময় শুকিয়ে যায়। কিন্তু সমস্যা হল গ্রাফটিং না করলে বিশ্রী ক্ষত হওয়া ও টান ধরে বিকৃতি (contracture) হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যার ফলে পরবর্তীকালে হাত পায়ের যথাযথ চলাচল সম্ভব হয় না। অবশ্য বেশ কিছু ক্ষেত্রে, গ্রাফটিং না করেও একইরকম ফল পাওয়া যায়। তাই এ ব্যাপারে আপনার ডাক্তারের পরামর্শমতো চলাই ভালো। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. সৌম্যকান্তি বাগ, এমবিবিএস, এমএস,
প্লাস্টিক সার্জারিতে উচ্চতর প্রশিক্ষণরত।

Advt.

রোগ নির্ণয়, রোগীর সেবাযত্ন ও
ওষুধ নিয়ে কিছু তথ্য

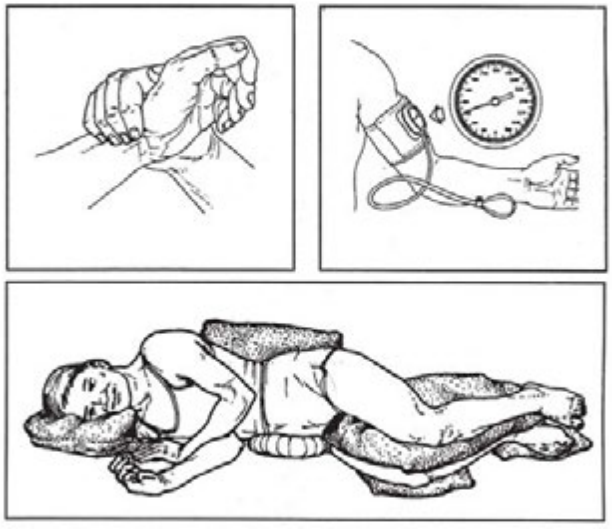

ডা. পুণ্যব্রত গুণ
শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ

শিশুর একজিমা ও তিনটি সংলাপ

ডা. জয়ন্ত দাস

সংলাপ ১

—ডাক্তারবাবু, একজিমা নয়তো?

—হ্যাঁ, একজিমাই তো।

—কি সব্বোনাশ! একজিমা?

—সব্বোনাশ? কেন, সব্বোনাশের কী হল?

—একজিমা মানেই সারবে না। হাঁপানি হবে। নোংরা রোগ একটা।

—সারবে তো! না সারার কী আছে। আর হাঁপানি? হ্যাঁ, আপনার বাচ্চার যে একজিমা হয়েছে সেটার নাম অ্যাটোপিক একজিমা। অ্যাটোপি সারা দেহের একটা রোগ। যাদের অ্যাটোপিক একজিমা হয় তাদের হাঁপানি হবার সম্ভাবনা একটু বেশিই থাকে।

—তাহলে কি ওর একজিমার চিকিৎসা করাব না? মানে বলছিলাম কি, হোমিওপ্যাথি দেখাই?

—কেন? সব ব্যাপারেই তো আমাদের, মানে আপনার ভাষায় অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারদের দেখান। হঠাৎ হোমিওপ্যাথির ওপর ভক্তি?

----মানে শুনেছি তো অ্যালোপ্যাথিতে স্টেরয়েড দেয় . . .

—তা দেয়। তো?

চিত্র ১. ছোট্ট বাচ্চার দু-গালে অ্যাটোপিক একজিমা

—স্টেরয়েড! মানে, এক্কেবারে স্টেরয়েড? খুব জোরালো ওষুধ যে ডাক্তারবাবু, ওইটুকু বাচ্চাকে দিলে সে কি আর . . .

—বাচ্চাকে তো বাচার ডোজেই স্টেরয়েড দেওয়া হবে, বড়োদের মাপে তো আর নয়। সেটুকু বাচ্চারা সবাই সহ্য করতে না পারলে স্টেরয়েড ওষুধটাই বাচ্চাদের জন্য কবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিত।

—ইঞ্জেকশন দেবেন নাকি?

> ইঞ্জেকশন দিলে সাধারণত সারা শরীরেই ওষুধটা ছড়িয়ে পড়ে, মলমে কেবল দরকারের জায়গায়।

—না। ইঞ্জেকশন দেবার দরকার হয় না বললেই চলে।

—তবে সিরাপ?

—তাও এখন দেব না। দেব মলম।

—মলম তো বাইরের থেকে চিকিৎসা। আপনি যে বললেন এই রোগটা সারা দেহের?

—মলম চামড়ার মধ্যে দিয়ে দেহের মধ্যে গিয়ে কাজ করে। অসুখ যেটুকু চামড়ায়, মলম সেটুকু চামড়ায় দিলেই চলে। ইঞ্জেকশন দিলে সাধারণত সারা শরীরেই ওষুধটা ছড়িয়ে পড়ে, মলমে কেবল দরকারের জায়গায়।

—মলম চামড়ার মধ্যে দিয়ে দেহের ভেতরে চলে যায়? তাহলে তো ইঞ্জেকশনের মতোই হল যে, ডাক্তারবাবু। আপনি বলুন, এরকম স্ট্রং ওষুধ, তারপর ইঞ্জেকশন না হলেও অনেকটা ইঞ্জেকশনের মতোই . . . ওইটুকু তো বাচ্চা . . .

—কী জ্বালা! মলম আবার ইঞ্জেকশনের মতো হতে যাবে কেন। মলম মলম, আর ইঞ্জেকশন হল ইঞ্জেকশন। আরে, ঘাবড়ে গেলেন নাকি। না, না, মজা মারছি না। আচ্ছা বলুন তো, এই একটা টিউব মলম, এতে কতটা ওষুধ থাকে?

—বলতে পারলে তো আমিই আপনার চেয়ারটায় বসতাম।

—নাঃ, আপনি এবার বোধহয় রেগেই গেছেন। আচ্ছা, আমি বলছি। একটা ইঞ্জেকশনে যতটা ওষুধ থাকে, ধরে নিন তার ছোটো এক অংশ থাকে এই গোটা টিউবে।

—তাতে কী?

----তাতে এই যে, মলমটা আপনার মেয়ে লাগাবে দশ দিন কি পনেরো দিন ধরে। ইঞ্জেকশন দিলে রোজ ধরুন গোটা একটা ইঞ্জেকশন দিতে হত। একটা ইঞ্জেকশনে একদিনে যতটা ওষুধ বাচ্চার শরীরে যেত তার একটা অংশ মাত্র মলম দিয়ে যাচ্ছে, তাও একদিনের জায়গায় দশদিন

> একজিমা হয়েছে মানে হাঁপানি হবার চান্স বেশি

ধরে। আবার তারও পুরোটা শরীরে অ্যাবজর্ব হচ্ছে না, মানে, শোষিত হচ্ছে না। কী, খুশি?

—কিন্তু মলম দিয়ে তো রোগটাকে চেপে দেবেন?

—চেপে দেব না তো কি রোগটাকে আল্লাদ দিয়ে মাথায় তুলব?

—না, ওঁরা যে বলেন রোগটাকে চেপে না দিয়ে বের করে দেওয়াই ভালো?

—হ্যাঁ, আপনার ওই একরত্তি মেয়ে সারাদিন সারারাত চুলকোবে, ঘুমোতে পারবে না, ঘা হবে, ইনফেকশান হয়ে পুঁজ হবে, সেটাই আপনার ভালো লাগবে তো? তাহলে বাড়ি যান, রোগ বের করার জন্য আলাদা করে চেষ্টা করতে হবে না। ওষুধ না দিলে এমনিই বেরোবে।

—আরে এবার দেখি আপনিই চটে যাচ্ছেন! তাঁরা যে বলেন, রোগটাকে চামড়ায় বেরোতে না দিলে ওইসব হবে। মানে হাঁপানি, আরও কী সব, সেসব ভারী জটিল রোগ যে!

—তা বের করে দিলে সেগুলো হবে না?

—কী জ্বালা ডাক্তারবাবু, আপনিই তো বললেন, আমার মেয়ের একজিমা হয়েছে মানে হাঁপানি হবার চান্স বেশি।

—তা চান্স তো বেশিই। কিন্তু সেটা কমানোর উপায় কি একজিমা না সারিয়ে রেখে দেওয়া?

—চেপে দিলেই তো পরে অন্যপথে বেরিয়ে আসবে . . . মানে ওঁরা যে বলেন . . .

—ওঁরা কী বলেন তার চাইতে বেশি কাজের কথা হল, কী ঘটে। একজিমা রোগীকে চিকিৎসা করে সারিয়ে দিলে, বা তার কষ্টগুলো কমিয়ে দিলে, হাঁপানি হবার চান্স মোটেই বাড়ে না।

—বলছেন?

—বলছি মানে? এটা আমার মুখের কথা নয়। অনেক রোগীকে দেখে, বছরের পর বছর ধরে তাদের অবজারভেশন করে, মানে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে, খুব নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে একজিমার চিকিৎসা করলে হাঁপানি হবার সম্ভাবনা বাড়ে না।

—কিন্তু শুধু তো ওঁরা নন, অনেকেই বলেন। মানে বয়স্ক মানুষরা সব বলেন, আর তাঁরা অভিজ্ঞতায় দেখেছেন বলেই না বলছেন।

—আসলে অভিজ্ঞতায় আমরা যা দেখি সেটা সবসময় পুরো সত্যি নয়। আমরা এক কথায় বলি, অ্যাটোপি। সেটা হল একটা প্রবণতা। অ্যাটোপিক একজিমা রোগটা চামড়ায় দু-একটা জায়গায় দেখা দিলেও সেটা আসলে সারা শরীরের ব্যাধি। সেই ব্যাধি যখন চামড়ার মধ্যে দিয়ে ফুটে বেরোয়, তখন হয় অ্যাটোপিক একজিমা। যখন নাকের মধ্যে হয়, তখন হয় অ্যালার্জিক সর্দি-হাঁচি। আর যখন ফুসফুসের শ্বাসবাহী নালীর মধ্যে দিয়ে হয় . . .

—তখন হয় হাঁপানি, মানে অ্যাজমা, তাই তো ডাক্তারবাবু?

—একদম ঠিক। বাঃ, এইবার তো বুঝেই গেছেন।

—কোথায় আর বুঝলাম? চামড়ার মধ্যে দিয়ে অ্যাটোপি রোগ হওয়াটা

> বয়স্ক মানুষেরা যে বলেন, একজিমা সারিয়ে দিলে আর হাঁপানি হল, সেটা তাঁরা নেহাত মিথ্যে কথা বলেন না।

চেপে দিলে তো সেই প্রবণতাটা কোথাও-না-কোথাও দিয়ে বেরোবেই? তার মানে সেই হাঁপানি!

—উফ, চেপে দেওয়া আর বেরিয়ে যাওয়া, এর বাইরে আপনাকে টানাহ্যাঁচড়া করেও বের করতে পারছি না। এবার তাহলে আপনি আমার ঘর থেকেই বেরিয়ে যান।

—সে কি কথা ডাক্তারবাবু, শোনাই তো হল না হাঁপানি না হলে প্রবণতাটা, মানে আপনি যাকে বলেন অ্যাটোপি, সেটা কী করবে!

—যান বলছি মশাই, নইলে মুশকিল হবে, হ্যাঁ। আপনার কথা শুনে

চিত্র ২. একটু বড়ো বাচ্চা, গালে অ্যাটোপিক একজিমা

আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছে, আপনাকে যাচ্ছেতাই গালাগালি করে ফেলতেই হবে।

—কী যে বলেন, আপনার মুখ থেকে গালাগালি? বেরোতেই পারে না।

> কষ্টগুলো দু-চার সপ্তাহে প্রায় পুরোই কমে যাবে। পুরো সারতে অবশ্য কতটা সময় লাগবে তা বলা সম্ভব নয়।

—কিন্তু গালাগালি না করলেও রাগটা তো থেকে যাবে। তখন আপনাকে দুমদাম মেরেও দিতে পারি। তার চাইতে দুটো গাল দিই, কেমন?

—আরে দূর, আপনি রাগ ঠিক হজম করে এখুনি হাসিমুখে বসবেন, এ আমি বেশ জানি।

—আপনার মেয়ের অ্যাটোপিও তাই, আমার মতন।

—মানে?

—একজিমা হয়ে অ্যাটোপির রাগ বের করতে না দিলে সে কিছুদিন পরে সেই রাগ হজম করে ফেলবে।

—তাই? কেমন করে জানলেন?

—ওই যে বললাম, অনেক রোগীর ওপর অবজারভেশন বা নিয়মমাফিক পর্যবেক্ষণ চালিয়ে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, বয়স্ক মানুষেরা যে বলেন, একজিমা সারিয়ে দিলে আর হাঁপানি হল, সেটা তাঁরা নেহাত মিথ্যে কথা বলেন না।

—ওই দেখুন ডাক্তারবাবু, আপনি নিজেই আবার ওঁদের মতো কথা বলছেন। কী সব্বোনাশ!

—হ্যাঁ, পুরো কথাটা না শুনলে ভারি সব্বোনাশ। বয়স্ক মানুষেরা যা দেখেছেন সেটা ঠিকই বলেন, সে হিসেবে মিথ্যে বলেন না। কিন্তু একজিমার পর হাঁপানি—এই রোগ দুটো পরপর ঘটার কারণ অন্য। অনেক অ্যাটোপির

রোগীর ছোটোবেলায় অ্যাটোপিক একজিমা হয়, একটু বড়ো বয়সে সেটা কমে যায়, আর সেই সময়েই হয় হাঁপানি। একজিমার যা হোক কিছু চিকিৎসা তো হয়ই, লোকে মনে করে চিকিৎসায় চামড়ার রোগ সারল, আর তার ফলেই হাঁপানি হল। কিন্তু চিকিৎসা না করলেও ব্যাপারটা একই হত, সেটা . . .

—অনেক রোগীর ওপর অবজারভেশন বা নিয়মমাফিক পর্যবেক্ষণ চালিয়ে দেখা গেছে, তাই না ডাক্তারবাবু?

—একদম তাই। সুতরাং, কী করবেন?

—একজিমার চিকিৎসা করব। কিন্তু ডাক্তারবাবু, ক-দিনে সারবে?

—আপনার মেয়ের তেমন বেশি তীব্র রোগ হয়নি, ওর কষ্টগুলো দু-চার সপ্তাহে প্রায় পুরোই কমে যাবে। পুরো সারতে অবশ্য কতটা সময় লাগবে তা বলা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে হাঁপানি বা সর্দি-কাশির ধাত হবে কিনা, সেও এখন বলতে পারব না।

অনেক অ্যাটোপির রোগীর ছোটোবেলায় অ্যাটোপিক একজিমা হয়, একটু বড়ো বয়সে সেটা কমে যায়, আর সেই সময়েই হয় হাঁপানি।

—সে তো বুঝতেই পারছি ডাক্তারবাবু, আপনারা অত মোটা মোটা বই পড়েও সব কি আর জানতে পেরেছেন? সেটা মেনে নিতেই হবে। যাকগে, এখন কী করব?

—ওষুধ কিনবেন।

—ওষুধ মানে স্টেরয়েড?

—হ্যাঁ, লাগানোর স্টেরয়েড মলম, আর মুখে খাবার অ্যান্টিহিস্টামিন। আরেকটা মলম দেব, ময়েশ্চারাইজার, সারা গায়ে লাগাতে হবে।

—অ্যান্টিহিস্টামিন? মানে অ্যালার্জির ওষুধ? খুব ঘুমোবে তো?

—তা ঘুমোক না। ও তো এখনও স্কুলে ভর্তি হয় নি, একটু আরামে ঘুমোক। চুলকানির কষ্ট পাবে না।

—অনেক জ্বালালাম ডাক্তারবাবু।

—তা জ্বালালেন। দু-সপ্তাহ পরে যখন আসবেন তখন মনে করে আরেকটু জ্বালাবেন, কেমন?

সংলাপ-২

—কমেছে?

—হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, অনেকটাই কমেছে।

—রাতে ঠিকঠাক ঘুমোচ্ছে?

—হ্যাঁ। প্রথম দু-দিন একটু ছটফট করছিল। তারপর থেকে রাতে ঘুমোচ্ছে, দিনেও যেন একটু ঢুলুনিভাব।

—তা তো একটু হবে। অ্যান্টিহিস্টামিন সিরাপ খাচ্ছে তো। এবার ওটার ডোজ কমিয়ে দেব, তারপর একেবারে বন্ধ করে দেব।

—তখন তাহলে খাবার ওষুধ থাকবেই না?

—না। খাবার ওষুধ দরকার হবে না।

—তবে আপনি আগে একবার যেন বললেন না, অ্যাটোপিক একজিমা রোগটা চামড়ায় দু-একটা জায়গায় দেখা দিলেও সেটা আসলে সারা শরীরের ব্যামো। তাহলে লাগানোর ওষুধ দিয়ে . . .

—বাঃ, বেশ মনে রেখেছেন তো কথাগুলো! ঠিকই, অ্যাটোপিক একজিমা সারা শরীরের ব্যাধি, যদিও রোগলক্ষণ প্রকাশ পায় চামড়ার খানিকটা অংশে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য সারা গায়েই একজিমা হতে পারে, কিন্তু সাধারণত তা হয় না।

—হ্যাঁ, মুখে মাথাতেই হয়, তাই না?

—আপনার মেয়ের বয়স তো একবছরও হয়নি, ওই বয়সে মুখে, মানে গালে, কপালে বেশি হয়। কানে, মাথাতেও হতে পারে। তবে ধড়ে, মানে ভালোভাষায় দেহকাণ্ডেও হতে পারে, হাতে পায়ে হতে পারে। ওই রকম ছোটো বাচ্চাদের প্রথম লক্ষণ সাধারণত মুখেই হয় অবশ্য।

—তার মানে আমার মেয়ের গায়ে-হাত-পায়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে?

—তা পারে। তবে ওষুধে সাড়া দিয়েছে যখন, তখন চিকিৎসা চালিয়ে গেলে ছড়ানোর সম্ভাবনা খুব কম।

—তাহলে তো খাবার ওষুধটা বন্ধ না করাই ভালো?

—তা নয়। খাবার ওষুধ অ্যান্টিহিস্টামিন সিরাপ কেবল রোগলক্ষণ কমায়। চুলকানি না থাকলে ওটা দেবার তেমন মানে হয় না। কিন্তু সারা গায়ে মাখার ওষুধটা চালাতে হবে।

—সারা গায়ে মাখার ওষুধটা? মানে আপনি যেটা বললেন ময়েশ্চারাইজার?

—হ্যাঁ, ওই ময়েশ্চারাইজারটাই। ওটা এখন সারা গায়ে মাখছে তো?

—মাখছে। কিন্তু সেটা তো ওর চামড়া শুকনো-শুকনো, তাই আপনি দিয়েছিলেন। রোগ সারাতে তো অন্য ওষুধ, মানে স্টেরয়েড মলম।

—অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিসের একটা বড়ো ব্যাপার হল শুকনো চামড়া। চামড়া শুধু শুকনো নয়, তার বেরিয়ার ফাংশনও কম।

প্রদাহ হল ক্ষতিকর জিনিস, জীবাণু বা বিষাক্ত কোনো জিনিস, সেগুলোকে নষ্ট করে দেবার একটা প্রক্রিয়া।

—ডাক্তারবাবু, উচ্চ-মাধ্যমিকে আমি ইংরাজিতে উনপঞ্চাশ।

—হে হে হে, ভুল হয়ে গেছে। অবশ্য আমিও সাতান্ন। কিন্তু বেরিয়ার ফাংশন কিছু এমন শক্ত কথা নয়। বাংলায় বললে বলব, বাঁধ দেবার ক্ষমতা।

—চামড়ায় বাঁধ?

—হ্যাঁ। বাঁধের কাজ হল আটকে রাখা। চামড়ায় জলীয় অংশ ঠিকঠাক না থাকলে সেই চামড়া বাঁধ বা পাঁচিল হিসেবে তেমন কাজ করতে পারে না। বাইরে থেকে জিনিস ভেতরে সহজে ঢুকে যায়, আর ভেতরের জিনিস বাইরে চলে আসে। অবশ্য সব জিনিস এরকম আসতে পারে না। কিন্তু নানা প্রদাহ তৈরি করার মতো জিনিস ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে।

—প্রদাহ? মানে?

—কী জ্বালা! ইংরাজিতে ইনফ্লামেশন বললে তো আবার আপনি উনপঞ্চাশের গল্প শোনাবেন! আপনাকে কোনোদিন ছোটো লাল পিঁপড়ে কামড়েছে?

—তা আবার কামড়ায়নি! উফ, সে কী জ্বালা, ইংরাজিতে উনপঞ্চাশের মতোই!

—বড়ো ডেয়োঁ পিঁপড়ে কামড়ালে জ্বালা আরও বেশি। ওই যে জ্বালা হওয়া, লাল হয়ে ফুলে ওঠা, ওটাই প্রদাহ। ইংরাজিতে ইনফ্লামেশন।

—তার মানে প্রদাহ হল পিঁপড়ে-টিঁপড়ে কামড়ানোর প্রতিক্রিয়া?

—ঠিক তা নয়। আপনার গায়ে কামড়ালে প্রদাহ হবে, কিন্তু এক টুকরো কাপড়ে কামড়ালে হবে না। মানে প্রদাহ হল আমাদের শরীরের একটা ধর্ম। পিঁপড়ে কামড়ালে হয়, আবার দেহের মধ্যে জীবাণু আক্রমণ করলেও হয়। ওই যে, ক-দিন আগে টনসিল ফুলে জ্বর হয়ে অ্যান্টিবায়োটিক খেলেন, সেটা জীবাণু আক্রমণের ফলে শরীরে প্রদাহ। প্রদাহ না থাকলে ওই সব জ্বর-টর হত না, গলাব্যথা হত না, বা পিঁপড়ে কামড়ালেও তেমন অসুবিধা হত না।

—শরীরের ধর্ম না কচু! অর্ধম বলুন! শরীর খামোকা কষ্ট পায়, আর সেটা শরীরের ধর্ম! অমন ধর্ম না থাকলেই ভালো ছিল।

—না না, প্রদাহ হল ক্ষতিকর জিনিস, জীবাণু বা বিষাক্ত কোনো জিনিস, সেগুলোকে নষ্ট করে দেবার একটা প্রক্রিয়া। তার সঙ্গে ব্যথা হয়, সেটারও উপকারিতা আছে। ব্যথা হয় বলেই তো আমরা বিশ্রাম নিতে বাধ্য হই, তাতে শরীরের বিপদ দূর করতে সুযোগ বাড়ে। তাই বলছিলাম . . .

—বুঝেছি, ঢের বুঝেছি, আর বুঝতে চাই না। আর প্রশ্ন করছি না বাবা, একজিমা থেকে কদ্দূর যে কথা গড়াল! বলুন চামড়ার ওই বাঁধের কাজের কথাটা, আর তার সঙ্গে ময়েশ্চারাইজার মাখানোর সম্পর্ক।

গন্ধ-ছাড়া ময়েশ্চারাইজার আমরা মাখাতে বলি, কেননা গন্ধদ্রব্য জাতীয় রাসায়নিকে অ্যাটোপিকদের অ্যালার্জি হবার চান্স বেশি।

—চামড়া তো আমাদের বর্ম, না থাকলে মারা পড়তাম। শরীর থেকে জল ও লবণ বেরিয়ে যেত হু-হু করে, আর বাইরের জীবাণু ও নানা ক্ষতিকর জিনিস ঢুকে পড়ত কোনো বাধা ছাড়াই। তা ছাড়াও চামড়ায় রয়েছে ঢুকে-পড়া ক্ষতিকর জীবাণুকে মারার ব্যবস্থাও। অ্যাটোপিক একজিমার রোগীর চামড়া দিয়ে জীবাণু ইত্যাদি ঢোকে তুলনায় সহজে, আর তাদের মারবার ব্যবস্থাটাও কমজোরি। এর ওপর আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়া হল, কিছু জীবাণুর দেহের প্রোটিন অ্যাটোপিকদের দেহে বেশি প্রদাহ তৈরি করে, যেমন স্ট্যাফাইলোকক্কাস-এর সুপার-অ্যান্টিজেন।

—ডাক্তারবাবু, ওরকম মেডিক্যাল কলেজের ক্লাসের মতোন বললে আমি বুঝতে পারব না যে!

—সরি সরি, একটু বেশি কঠিন হচ্ছে বোধহয়। মোট কথাটা হল, অ্যাটোপিকদের ত্বকে চট করে প্রদাহ হয়, আর জীবাণু-সংক্রমণ, বিশেষ করে স্ট্যাফাইলোকক্কাস নামে জীবাণু সংক্রমণ হয় বেশি। আবার, স্ট্যাফ সংক্রমণ হলে সেটা অ্যাটোপিক একজিমাকে বাড়িয়ে দেয়।

—স্ট্যাফ আবার কী?

—স্ট্যাফাইলোকক্কাস-এর ডাকনাম। এই জীবাণুর নামটা আপনার চেনা

চিত্র ৩. আরেকটি শিশুর অ্যাটোপিক একজিমা

নয়, কিন্তু এর উপদ্রবে নির্ঘাত ভুগেছেন একবার না একবার। চামড়ায় যে ফোঁড়া হয় সেগুলো প্রায় সবসময়ই স্ট্যাফ-এর সংক্রমণ।

—তাহলে তো আমার মেয়ের ভারি বিপদ! ওকে কী সবসময় অ্যান্টিবায়োটিক খাইয়ে যেতে হবে?

—আরে না না। খালি মনে রাখবেন, ওর কোনো সংক্রমণ হলে, বিশেষ করে চামড়ায় পুঁজ নিয়ে কিছু হলে, শিগগির চিকিৎসা করতে হবে। আর ওর রোগ তেমন তীব্র নয়, অন্তত শীতকালে ওকে ময়েশ্চারাইজার মাখাতেই হবে, গরমকালে যদি মনে হয় চামড়া শুকনো, তাহলে গরমকালেও মাখাতে হবে।

—যে কোনো ময়েশ্চারাইজার মাখাব?

—না, সাধারণত গন্ধ-ছাড়া ময়েশ্চারাইজার আমরা মাখাতে বলি, কেননা গন্ধদ্রব্য জাতীয় রাসায়নিকে অ্যাটোপিকদের অ্যালার্জি হবার চান্স বেশি। তখন সুগন্ধি ময়েশ্চারাইজার মাখিয়ে উলটো বিপত্তি, প্রদাহ বেড়ে যাবে। সাধারণভাবে কসমেটিক্স হিসেবে যেসব ময়েশ্চারাইজার পাওয়া

জোরালো স্টেরয়েড মলম তাড়াতাড়ি চামড়া পাতলা করে বলে বাচ্চাদের আমরা দিই না, আর কারোরই মুখে লাগাতে দিই না।

যায় সেগুলোতে কিছু গন্ধদ্রব্য মেশানো থাকে। এমনকী ওষুধ হিসেবে আমরা যে সব ময়েশ্চারাইজার লিখি, তাদের অধিকাংশের মধ্যেও গন্ধদ্রব্য মেশায়। বিকল্প নেই, আমরা অনেকটাই ওষুধ-কোম্পানির হাতে। তবু গন্ধদ্রব্যের মধ্যে তারতম্য আছে, সবগুলো সমান অ্যালার্জি করে না। আবার সব ময়েশ্চারাইজার সমান কাজের, তাও তো নয়। সে সব ভেবেই

ময়েশ্চারাইজার বাছতে হয়। তারপরে দেখতে হয় ময়েশ্চারাইজার মাখার পরে-পরেই চুলকানি বাড়ছে কিনা—মানে ময়েশ্চারাইজারে অ্যালার্জি—সে ক্ষেত্রে বদলাতে হয় সেটা।

—আর টিউবের যে ওষুধটা দিয়েছেন?

—ওটা স্টেরয়েড মলম। ওটাই একজিমা-হওয়া চামড়াকে স্বাভাবিক করতে প্রাথমিক ওষুধ। যদি কোনো রোগী ময়েশ্চারাইজার কিনতে না পারে, আমরা বলি, নারকেল তেল মাখুন। কিন্তু স্টেরয়েড মলম আমাদের প্রায় সবসময় দিতেই হয়।

—স্টেরয়েড মলম 'প্রায়' সবসময় দেন? মানে, দিতেই হয় এমন নয়?

—না, কোনো সময় কেবল ট্যাক্রোলিমাস বা পিমেক্রোলিমাস মলম দিলেও চলে। বিশেষ করে বাচ্চাদের, আর যদি কম তীব্র আক্রমণ হয়। যেমন আপনার মেয়েকে—আর কিছুদিন স্টেরয়েড মলম দিয়ে তারপর ট্যাক্রোলিমাস-এর ওপরেই রাখব বলে ভাবছি। সমস্যা হল, ট্যাক্রোলিমাস দামি, আর অনেকের চামড়ায় জ্বালা হয়। পিমেক্রোলিমাস-এ জ্বালা খুব কম ক্ষেত্রে হয়, কিন্তু সেটা আবার আরও বেশি দামি। তাই শরীরের অল্প জায়গায় না হলে ওগুলো না দেওয়াই ভালো। তার ওপর ওগুলো দিলেও যে নিশ্চিন্ত, তা নয়।

—স্টেরয়েড মলম দিলে নিশ্চিন্ত?

—না। স্টেরয়েড মলমে সাইড এফেক্ট আছে। প্রথম স্থানীয় প্রতিক্রিয়া। কোনো সংক্রমণ থাকলে সেটা সহজে বেড়ে যেতে পারে, আর মনে রাখবেন অ্যাটোপিকদের চামড়া এমনিতেই সংক্রমণকে তেমন সহজে সারাতে

অ্যাটোপিক একজিমার ডায়াগনোসিস মূলত ক্লিনিক্যাল, অর্থাৎ রোগের ইতিহাস শুনে, রোগীকে পরীক্ষা করে এই রোগ ধরা যায়।

পারে না। এছাড়া বেশিদিন লাগালে চামড়া পাতলা হয়ে যেতে পারে, বিশেষ করে বাচ্চাদেরও মুখ, কুঁচকি এরকম সব জায়গায়, যেখানে চামড়া এমনিতেই পাতলা। জোরালো স্টেরয়েড মলম তাড়াতাড়ি চামড়া পাতলা করে বলে বাচ্চাদের আমরা দিই না, মুখেও দিই না। মুখে বেশি লাগালে ব্রণর মতো বেরোয়, মুখে লোম বেরোয়, রোদে গেলে জ্বালা করে—এরকম হাজারও পার্শ্বক্রিয়ার লিস্ট আছে। সুতরাং যতদিন বলে দিচ্ছি ততদিনের বেশি মলম লাগাবেন না। মাঝে-মধ্যে দেখে নেব সাইড এফেক্ট হল কিনা, আর কাজই বা কতটা হল, আর সেই অনুযায়ী ওষুধ বদলানো বা কমানো-বাড়ানো করতে হবে।

—যাক বাবা, ভেতরে গিয়ে কোনো ক্ষতি তো করে না মলম!

—না না, তাও করে। আমি বলছিলাম স্থানীয় প্রতিক্রিয়ার কথা। কিন্তু গোটা দেহের ওপর প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। সেটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হবার সম্ভাবনা বেশি। আবার বলছি, আপনার মেয়ের শরীরে তেমন কিছু হবে না, কেননা অল্প জায়গায় অল্প মলম লাগিয়েই কাজ হচ্ছে। কিন্তু অনেকটা জায়গায় অনেকটা মলম যদি লাগাতে হত, যেমনটা হয় খুব তীব্র রোগ ও ছড়িয়ে পড়া রোগের জন্য, তাহলে কিন্তু লাগানো মলম

চিত্র ৪. এটা কিন্তু অ্যাটোপিক একজিমা নয়, সেবোরিক একজিমা!

শরীরে যে পরিমাণ ঢুকত তাতে মুখে খাবার, বা ইঞ্জেকশনে নেওয়া স্টেরয়েডের মতোই সাইড এফেক্ট হত। সে এক লম্বা ফর্দ, এখন অত বলার সময় নেই, আপনার শুনে কাজও নেই।

—খাবার স্টেরয়েড দিতে হবে না ভাগ্যিস!

—হ্যাঁ, আপনার মেয়ের তো তেমন জোরালো অসুখ হয়নি, ওকে খাবার কিংবা ইঞ্জেকশনের স্টেরয়েড দিতে হবে না বলেই মনে হয়, যদি না আপনি চিকিৎসায় গাফিলতি করেন। কিন্তু বেশি তীব্র রোগ হলে বা সারা শরীরে রোগ ছড়ানোর মতো অবস্থা হলে খাবার বা ইঞ্জেকশনে স্টেরয়েড দিতে হয়, ওর থেকেও জোরালো ওষুধ, বেশি সাইড এফেক্ট আছে এমন ওষুধও দিতে হয়; না দিয়ে উপায় থাকে না।

সংলাপ-৩

—কেমন আছে আপনার মেয়ে?

—এই তো দেখুন, এখন দিব্যি আছে। চুলকানি নেই। চামাড়াটা একটু শুকনো, মুখের পুরোনো চুলকানির জায়গাগুলো কেমন কালচে হয়ে গেছে। আর দেখুন, মুখে-গলায় কেমন একটা সাদা সাদা দাগ—কী এটা?

অনেক সময় সেবোরিক ডার্মাটাইটিস বা সেবোরিক একজিমা থেকে অ্যাটোপিক একজিমাকে আলাদা করে চেনা শক্ত

—ওটার নাম পিটিরিয়াসিস অ্যালবা। নাম শুনে ঘাবড়ে যাবেন না, ওগুলো শ্বেতি বা তেমন কিছু সিরিয়াস নয়, ওষুধ দিলে কমবে, ক-দিন পর আবার হবে, কিন্তু শেষমেশ ঠিক সেরে যাবে।

—আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনি কী করে ধরলেন এটা অ্যাটোপিক একজিমা? অন্য কোনো চর্মরোগ নয়? কোনো টেস্টও তো করালেন না দেখলাম।

—ও বাবা, সে তো বিরাট গল্প, মোটা বই আছে সে নিয়ে। তার মোদ্দা কথাগুলো অবশ্য আপনার বোঝার মতো করে বাংলা ভাষায় বলা যায়, কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের লেকচারের মতো হবে, আগেই হুঁশিয়ারি দিচ্ছি।

অ্যাটোপিক একজিমার ডায়াগনোসিস মূলত ক্লিনিক্যাল, অর্থাৎ রোগের ইতিহাস শুনে, রোগীকে পরীক্ষা করে এই রোগ ধরা যায়। কিছু রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা করতে হতে পারে, তবে সেটা রোগ ধরার জন্য নয়, চিকিৎসার সুবিধার জন্য, রোগের জটিলতা ধরার জন্য, বা ওই রকম নানা কারণে।

অভিজ্ঞ ডাক্তার যত্ন নিয়ে দেখলে রোগটা প্রায় সবসময়েই ধরতে পারেন, গুচ্ছের পরীক্ষার দরকার নেই।

ক্লিনিক্যালি কী কী দেখি আমরা? প্রথম কথা হল, অ্যাটোপিক একজিমায় বেশ কিছুদিন ধরে চুলকাবে, বা একবার হয়তো চুলকানি কমবে, কিন্তু আবার চুলকানি শুরু হবে, চট করে পুরো সারবে না। দ্বিতীয় দেখার জিনিস হল কোন বয়সে হচ্ছে, আর কোথায় হচ্ছে। শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে রোগ শুরু হয় ৫ বছর বয়সের মধ্যে। একবছর বয়সের মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, যেমন আপনার মেয়ের হয়েছে। আর একবছরের মধ্যে বয়সিদের রোগ শুরু হয় সাধারণত মুখে ও মাথায়, বিশেষ করে দুটো গাল, কপাল—এইসব জায়গায় চুলকায়, লাল হয়ে যায়, একটু খোসা-ওঠা ভাব থাকতে পারে, সামান্য রস কাটতে পারে। গায়ে, মানে আমরা যাকে ধড় বা দেহকাণ্ড বলি, সেখানে হতে পারে, হাতে পায়ের বাইরের দিকেও হতে পারে। মুখ-মাথার বাইরে এসব জায়গায় হলে বুঝতে হবে রোগটা একটু বেশি তীব্র, অথবা প্রথম অবস্থায় যত্ন নেওয়া হয়নি, হয়তো ভাবা হয়েছে রোগটা চামড়ায় বেরিয়ে গেলেই ভালো। তবে মুখ-মাথা-ধড়-হাত-পা, যেখানেই হোক, চুলকানি লালভাব, খোসা-ওঠা, রস কাটা—এসব থাকে।

যেমন বয়স বাড়তে থাকে রোগের জায়গা ও চরিত্র বদলাতে থাকে। একটু বড়ো বয়সে, মানে মোটামুটি এক বছর থেকে পাঁচবছর পর্যন্ত, রোগ শুরু হলে বা শুরু হওয়া রোগ না সারলে, মুখের চামড়া হয়তো ঠিক থাকে, কিন্তু হাতের কনুই আর পায়ের হাঁটু—এদের ভাঁজের দিকটায়, কব্জির সামনের দিকে, গোড়ালিতে চুলকায়। এখন আর ততটা লাল হয় না, বরং চুলকে চুলকে চামড়াটা খানিক মোটা আর কালো হয়ে যায়, জায়গাটা শুকনো খড়ি-ওঠা-মতন হয়, রস কাটার সম্ভাবনা কম। আরেকটু বেশি বয়সে, ধরুন দশ-বারো বছর বয়সে, এইরকম প্যাটার্নই বজায় থাকে, কিন্তু তার সঙ্গে আবার মুখ, হাত-পায়ের পাতা ও আঙুলে একজিমা দেখা দিতে পারে। আর গোল-গোল চাকা-চাকা লালচে-কালো একটু উঁচু দাগ, দেখলে হঠাৎ দাদ বলে ভুল হয়, এমন 'মুদ্রাকৃতি একজিমা' দেখা যায় একবছর বয়স থেকে পরে যেকোনো বয়সে। বেশি বয়সে অ্যাটোপিক একজিমা নানান রূপ নিতে পারে, আবার বেশি লোকের হয়ও না, তাই সেটা নিয়ে আর বলছি না।

যেকোনো বয়সে এছাড়াও দেখা যায় সাধারণভাবে শুকনো ত্বক, বা কোনো কোনো সময় শুকনো ত্বকের ওপর মাছের আঁশের মতো দাগ (ইকথিওসিস), হাত-পায়ের পাতায় অনেক রেখা অগভীর রেখা, নানা জায়গায় চামড়ার ওপরের স্তর মোটা হবার ফলে কালো দাগ, এবং লোমকূপে শক্ত কাঁটা-কাঁটা ভাব, যাকে বাংলায় 'পদ্মকাঁটা' বলার চল আছে। অবশ্য 'পদ্মকাঁটা' আরও অনেক কারণে হতে পারে। মুখে ঘাড়ে হাতে সাদা সাদা ছোপ হতে পারে, আমরা বলি পিটিরিয়াসিস অ্যালবা, সেটাও অ্যাটোপিক একজিমা ছাড়া অন্য কারণে হতে পারে। এছাড়াও অনেক ছোটোখাটো দেখার জিনিস আছে।

ইতিহাস নেবার সময় মনে রাখতে হবে, রোগীর নিজের বা তার কোনো রক্তসম্পর্কিত নিকটাত্মীয়, যথা মা-বাবা ভাই বোন ইত্যাদির কোনো অ্যাটোপিক রোগ আছে বা ছিল কিনা।

—আপনাকে খামোকা বকালাম, এত কিছু মনে থাকবে না ডাক্তারবাবু। কিন্তু আমার ভাগ্নে, ওই যে মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করল এই জুলাইতে, বলছিল এটা সেবোরিক না কি যেন বলে, সেই একজিমা হতে পারে। বাচ্চাদের ডিপার্টমেন্টে এরকম দেখেছে নাকি।

—হ্যাঁ, অনেক সময় সেবোরিক ডার্মাটাইটিস বা সেবোরিক একজিমা থেকে অ্যাটোপিক একজিমাকে আলাদা করে চেনা শক্ত, যদিও আপনার মেয়ের কেসটা সোজাসাপটা অ্যাটোপিক। আপনার মনে রাখা সম্ভব নয়, তবু বলে দিই, বাচ্চা বয়সের সেবোরিক ডার্মাটাইটিস চোখের ভ্রূ, নাকের পাশ, কানের পেছন, কুঁচকি, বগল, আর মাথায় লালচে খোসা ওঠা হয়, মাথায় খুস্কির মতো দেখায়, আর অ্যাটোপিকের মতো চুলকানি সাধারণত হয় না। একবছর বয়সের পর সেবোরিক ডার্মাটাইটিস নিজে নিজেই সেরে উঠতে থাকে, অবশ্য কোনো অ্যাটোপিকও ওভাবে সেরে উঠতে পারে।

এছাড়াও অ্যাটোপিক একজিমার সঙ্গে গুলিয়ে যেতে পারে অন্য কিছু রোগও। স্পর্শজনিত একজিমা, সোরিয়াসিস, দাদ আর খোস বা স্কেবিজ—এদেরকে একবার দেখেই অ্যাটোপিক একজিমার থেকে আলাদা করতে সবসময় পারা যায় না। তবে কয়েকবার যত্ন করে দেখলে, রোগের ইতিহাস খুঁটিয়ে শুনলে, ভুল হবার চান্স কম।

—আপনি বেশ ভালোই পড়ালেন, কিন্তু আমার কিছু মনে থাকলে হয়। তবে বুঝলাম, অভিজ্ঞ ডাক্তার যত্ন নিয়ে দেখলে রোগটা প্রায় সবসময়েই ধরতে পারেন, আর গুচ্ছের পরীক্ষার দরকার নেই। কিন্তু আমার মেয়েরই এমন একটা রোগ হল . . .

—অ্যাটোপিক একজিমা খুব কমন রোগ। আমাদের দেশে পরিসংখ্যানের অভাব, কিন্তু আমেরিকান বিশেষজ্ঞ সংস্থা বলছে, ওদের দেশে শতকরা ১৫ ভাগ বাচ্চার অ্যাটোপিক একজিমা হয়। এটাকে তেমন 'দুর্ভাগ্য' মনে করার চাইতে বরং ভাবুন, আপনার 'সৌভাগ্য' যে মেয়ের একজিমাটা বেশি তীব্র নয়, তাড়াতাড়ি ধরা পড়েছে, আর ওষুধে রোগটা খুব ভালো সাড়া দিয়েছে। এবার নিয়মমতো দেখিয়ে যাওয়া আর দরকার মতো ওষুধ কমানো-বাড়ানো, ব্যস! স্বাস্থ্যের রঙে

ডা. জয়ন্ত দাস, এমবিবিএস, এমডি, চর্মরোগবিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

পোশাকের বিবর্তন—'পণ্য' ও ফাংগাস

'দাদ' নামক সামান্য ছত্রাক-সংক্রমণ এখন সারানো কঠিন হয়ে উঠেছে, আর তার জন্য আমাদের পোশাক অনেকটাই দায়ী—লিখেছেন **ডা. শর্মিষ্ঠা দাস**।

চিত্র ১. দাদ ও টাইট অর্ন্তবাস

ছত্রাক!! ব্যাঙের ছাতা মাথার ছাতা—ছাতা অনেক রকম! চর্মরোগের অনেকখানিক অংশ জুড়েও রয়েছে ছত্রাক সংক্রমণ। পৃথিবীতে ১.৫ মিলিয়নের বেশি প্রজাতির ছত্রাকের বাস!! গরম ও ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে নিত্য ব্যবহারের জিনিসপত্রে নীলচে সাদা গুঁড়ো মতো আবরণ পড়তে আমরা হামেশাই দেখি, যাকে 'ছাতা পড়া' বলি। এইসব ছত্রাক আবহাওয়াতেই থাকে আমাদের দেশে। ত্বকেও ঠিক সেইরকম ছাতাই পড়ে উপযুক্ত আবহাওয়া পেলে। ত্বকের ছত্রাক সংক্রমণ আবার উপরের স্তরে ও গভীর স্তরে হয়—অনেক রকমেরও হয়। গভীর নয়—উপরিস্তরের যে ছত্রাক সংক্রমণ, ডাক্তারি পরিভাষায় যার একটি ধরন হল 'ডার্মাটোফাইট' (Dermatophyte) সংক্রমণ, তাকে নিয়েই আজকের আলোচনা। সোজা বাংলায় যাকে বলে 'দাদ'। দাদ কথাটি এতই নিরীহ যে তাকে এতদিন পর্যন্ত প্রায় কোনো রোগের মর্যাদাই দেয়নি মানুষ! 'চুলকাইতে দাদ/বড়োই আরাম' বলে আদ্যিকালের ঢোল কোম্পানির মলম থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপন দেখে যা-ইচ্ছে-তাই লাগিয়েই ক্ষান্ত থেকেছে এবং 'দাদ' মশাইও সেরকম ভিলেন হয়ে ওঠেনি—গ্রীষ্ম বর্ষায় একটু-আধটু জ্বালাতন করে আবার ঠান্ডা পড়লেই বিদায় নিয়েছে। কিন্তু গোপনে এই নিরীহ দাদ-ই যে কী ভয়ংকর শক্তিশালী হয়ে উঠেছে তা সাধারণ মানুষ এখনও বুঝে উঠতে পারেননি।

এই ডার্মাটোফাইট-রা ত্বকের কেরাটিন থাকে এরকম জীবকেই আক্রমণ করে। মানুষের চুল, নখ, চামড়া সবেতেই কেরাটিন—সুতরাং ছত্রাকদের অঢেল খাবার!! ত্বকের এই কেরাটিন খেয়ে বাবাজীবনরা ফুলেফেঁপে ওঠেন, বংশবৃদ্ধি করেন আর চামড়াতে ফুসকুড়ি, ফোস্কা, গোল গোল দাগ, চুলকানি এইসব সৃষ্টি করেন! এই ডার্মাটোফাইটদের নানা প্রজাতি আছে, গণ মোটামুটি তিনটে----Trichophyton, Microsporoh ও Epidermophyton। এরা এক একজন শরীরের বিশেষ কিছু জায়গা পছন্দ করে এবং সেখানেই বাসা বাঁধে। শরীরের আক্রান্ত অঞ্চল অনুযায়ী তখন দাদের বিভিন্ন ডাক্তারি নাম হয় যেমন—কুঁচকিতে দাদ হল Tinea cruris, মাথায় হলে Tinea capitis, নখে ছত্রাক হলে Tinea unguum —এই রকম।

কখন ছত্রাক রোগ সৃষ্টি করে?

ছত্রাক তো আবহাওয়াতে এমনিতেই থাকে—কিন্তু রোগ সৃষ্টি করে কখন? যখন খুব অনুকূল পরিবেশ পায়। মানুষের সাধারণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যদি কোনো কারণে কমে যায় (যেমন ডায়াবেটিস, AIDS, দীর্ঘদিন স্টেরয়েড খেতে হয় এমন অসুখ) তখন ত্বকে সাধারণভাবে বসবাসকারী ছত্রাকও সংক্রমণ তৈরি করে। আবার এমনও হতে পারে রোগীর প্রতিরোধ ক্ষমতা মন্দ নয় কিন্তু কোনো কারণে এমন পরিবেশ সৃষ্টি হল যে ছত্রাকের বংশবৃদ্ধি ক্ষমতা খুব বেড়ে গেল—তখনও রোগ হবে। উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়ায় ঘাম হয়। এই ঘাম যদি দীর্ঘ সময় ধরে শরীরের উপর জলীয় প্রলেপ তৈরি করে তাহলে ছত্রাকদের মহা আনন্দ! আর পোশাক যদি এমন হয় যে ঘামে ভিজে তা দীর্ঘসময় শরীরের সঙ্গে লেপটে রইল—ঘাম শুকোবার অবকাশই পেল না তাহলে তো ছত্রাকদের পোয়াবারো!!

ঘাম যদি দীর্ঘ সময় ধরে শরীরের উপর জলীয় প্রলেপ তৈরি করে তাহলে ছত্রাকদের মহা আনন্দ!

পোশাক ও ছত্রাকের সম্পর্ক

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ক্রান্তীয় আবহাওয়ায় দীর্ঘদিন কাটানো সৈনিকদের সবার পায়ে মারাত্মক ছত্রাক সংক্রমণ হয়েছিল তখন কারণ বোঝা গিয়েছিল—আঁটোসাঁটো মোটা ভারী জুতো মোজা পরে থাকা। সৈনিকদের না হয় জঙ্গলে দুর্গম অঞ্চলে থাকার জন্য অমন পোশাক পরতে হত—কিন্তু উত্তর আধুনিককালে আটলান্টা আর আন্দুল, বস্টন আর বজবজ—সবাই যে পোশাকে-আশাকে একেবারে এক ছাঁচে ঢালা আন্তর্জাতিক নাগরিক হয়ে উঠছেন তার এক কুফল হল দীর্ঘস্থায়ী দুরারোগ্য ছত্রাক সংক্রমণ—এমন বললে ভুল হয় না!

সভ্যতার আদিম পর্যায়ে পোশাকের আবির্ভাব শুধুমাত্র দৈহিক প্রয়োজনে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে পোশাকের প্রথম ও শেষ প্রয়োজন শুধুমাত্র জৈবিক—দেহকে রোদ, তাপ, ঠান্ডা, ধুলো হাওয়া থেকে আগলে রাখা।

পোশাকের কথা

দু-লাখ বছর আগে আদিমানব এই কারণেই নিম্নাঙ্গে পশুচর্ম পরার উপায় শিখেছিল শারীরিক প্রয়োজনের তাগিদ থেকে। ৪০,০০০ বছর আগে ক্রো-ম্যাগনঁ (Cro-magnon) মানুষ চারকোণা পশু চর্মের মাঝখানে ফুটো করে বানিয়ে ফেলল বিশ্বের প্রথম টিউনিক যা দিয়ে উর্ধ্বাঙ্গ ঢেকে দেওয়া গেল। এরপর বৃক্ষবল্কল-তুলাচাষ-বস্ত্রবুনন প্রক্রিয়ায় পারদর্শিতা অর্জন ইত্যাদি অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পোশাকের ঐতিহাসিক যাত্রা। এই যাত্রা পথরেখায় পোশাকের প্রাথমিক পর্যায়ে নিয়ন্ত্রক যদি হয় শুধু জলবায়ু ও শারীরিক প্রয়োজন, রেখাটির অপরপ্রান্তে ঠিক বর্তমানে যে বিন্দুতে আমরা দাঁড়িয়ে সেখানে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় বিভিন্ন বহুজাতিক পোশাক নির্মাণ সংস্থা ও পণ্যবাদ!!

চিত্র ২. দাদ ও টাইট অর্ন্তবাস

পণ্য, পণ্যবাদ, পণ্যমোহবদ্ধতা

পণ্য হল যা পয়সা দিয়ে কেনা যায়—একজন মানুষ বাজার থেকে যা কিনতে পারে, যা সরাসরি শ্রম বা মেধা দিয়ে অর্জন করতে হয় না। প্রাচীন 'বিনিময় প্রথাটায় প্রয়োজনীয় জিনিস অর্জনের পরে কোনো এক সময় ধীরে ধীরে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো মুদ্রার দ্বারা কেনা হতে লাগল। কীভাবে একটা জিনিস 'পণ্য' চরিত্র অর্জন করে সে কথা সমাজবিদ-অর্থনীতিবিদরা বলবেন। কিন্তু পণ্য হয়ে উঠলে পরে সমাজে ও মনোজগতে সেই দ্রব্যগুলো প্রভাব ফেলতে শুরু করে। এভাবে একদিন প্রয়োজনের জন্য পণ্য নয়, পণ্য আছে বলেই তার 'প্রয়োজন' সৃষ্টি করা হল, প্রয়োজন বানানো' হল। সেটাকেই আমরা বলতে পারি 'পণ্যবাদ'। 'পণ্যবাদ' বলতে কী বোঝাতে চাইছি, কী বোঝানো যায়, তার বিস্তৃত আলোচনায় যাবার পরিসর এটা নয়। মোটের ওপর বলা যায়, ভোগবাদ (consumerism) যে

> যারা পণ্য তৈরি করে, বিপণন করে, বিজ্ঞাপন করে, তারা ক্রেতার পছন্দ নির্ধারণ করে।

তত্ত্ব, সেটি বলে যে ক্রেতার পছন্দই হল সব থেকে বড়ো কথা, ক্রেতা যা চাইছে সেটা যেন 'বাজার' তার সামনে হাজির করে। কিন্তু 'ক্রেতার পছন্দ' ব্যাপারটা ক্রেতার নিজস্ব ব্যাপার নয়, বরং উলটো। যারা পণ্য তৈরি করে, বিপণন করে, বিজ্ঞাপন করে, তারা ক্রেতার পছন্দ নির্ধারণ করে। ভোগের ব্যাপার 'ভোগী' নয়, 'পণ্য'-ই চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে।

মানুষের মস্তিষ্কের নির্বাচন ক্ষমতাই ধীরে ধীরে নানাভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, মস্তিষ্কের কোষে কোষে বিজ্ঞাপনের উপনিবেশ। সেটা বিজ্ঞাপনের প্রত্যক্ষ আক্রমণ হতে পারে— ''অমুক দোকান থেকে অমুক কোম্পানির এই পোশাক পরুন—দেখুন নর্মাল হোক বা ক্যাজুয়াল, অফিসে অথবা পার্টিতে আপনি হয়ে উঠুন সবার রোল মডেল।'' আবার সেটা হতে পারে সিনেমা- টেলিসিরিয়াল-বিউটি কনটেস্ট-এর সূক্ষ্ম উপনিবেশ-স্থাপন, হতে পারে বিয়েবাড়ি অফিস ক্লাব-রকে 'বেমানানকে' অদৃশ্য করার সামাজিক চাপ। প্রতিদিন প্রতি সময়ে প্রতি জায়গায় বিজ্ঞাপনের শো-এ সামাজিকতায় দেখানেপনায় দৃশ্যমানতায় এই চলমান কনসেনশাস (consensus) নির্মাণ প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিমানুষের মস্তিষ্কের কোষে পণ্য আক্রমণ এমনভাবে খোদাই হয়ে চলেছে যে ক্রেতার নিজস্ব নির্বাচন ক্ষমতা শূন্যে এসে ঠেকেছে— 'পণ্যবাদ'-এর ক্ষমতাও বদলাতে বসেছে ক্রমাগত 'মানুষের জন্য পণ্য' স্লোগানের আড়ালে গড়ে উঠেছে পণ্যমোহবদ্ধতা (commodity fetishism) 'পণ্যের জন্য মানুষ'।

পোশাকের অ-পণ্য বিবর্তন থেকে পণ্য-বিবর্তন

আবার পোশাকের বিবর্তনের গল্পে ফিরি। পশুচর্মের পরে এল বৃক্ষবল্কল, তারপর তাঁত ও পশমজাত বস্ত্র। সবচেয়ে পুরোনো তাঁতবস্ত্রের নমুনা পাওয়া গেল মেক্সিকোতে যা প্রায় ৭ হাজার বছর আগে তৈরি; ভারত, পাকিস্তান ও ইজিপ্টের মানুষ ৩ হাজার বছর আগেই বস্ত্রবয়নশিল্পে পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। প্রয়োজন থেকেই এইসব গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশে তুলোচাষ ও তাঁতবোনা শুরু হয়েছিল, কারণ সুতিবস্ত্র উষ্ণ আবহাওয়ায় আরামপ্রদ। ঋগ্বেদেও তাঁতের বস্ত্রের উল্লেখ আছে। তখন স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই সেলাই না করা অবস্থায় বস্ত্রখণ্ডকেই বিভিন্নভাবে পোশাক হিসাবে ব্যবহার করতেন অধিকাংশ সময়ে। প্রাচীন শিল্পসাহিত্য থেকে জানা যায় ভারতে পুরুষেরা নিম্নাঙ্গে ধুতি, উর্ধ্বাঙ্গে উত্তরীয় ব্যবহার করতেন। নারীরা বস্ত্রখণ্ডকেই কোথাও মালকোঁচা মেরে, কোথাও লুঙ্গির মতো ঝুলিয়ে কুঁচি দিয়ে পরতেন। অপেক্ষাকৃত ছোটো বস্ত্রখণ্ড দিয়ে স্তনদ্বয় আবৃত করে পেছনে গিঁটে বেঁধে তৈরি হত স্তনপট্ট। প্রাচীনকাল থেকেই 'সিল্করুট' দিয়ে রেশমবস্ত্র আমদানি হত ঠিকই কিন্তু তা ছিল ধনী ও রাজপরিবারের উৎসবের পোশাক। নিত্য ব্যবহারের জন্য সুতিবস্ত্রই প্রচলিত ছিল। খোলামেলা সুতির পোশাকে খুব স্বাভাবিকভাবেই অনেক চর্মরোগ আটকানো যেত। প্রাচীন ভারতে কুষ্ঠরোগ, কর্কটরোগের বহু উল্লেখ আছে, কিন্তু ছত্রাকজনিত রোগ যেমন দাদ গোষ্ঠীভুক্ত কোনো রোগের উল্লেখ নেই।

বিশেষ করে কুঁচকি বগল ইত্যাদি অংশে, শরীরের ভাঁজে ভাঁজে দাদ এখন প্রায় মহামারীর আকার নিতে চলেছে—তার এত রমরমা সেলাই করা টাইট ফিটিং পোশাকের জন্য। ''পলিয়েস্টার বিপ্লব''-এর সঙ্গে সঙ্গে এই আঁটোসাঁটো পোশাকের উপাদানও বদলেছে এবং সমস্যাও বেড়েছে। আগেই বলা হয়েছে উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়ায় ছত্রাক বংশবৃদ্ধির অনুকূল

পরিবেশ পায়। পুরোনো- দিনের ঢিলেঢালা সুতির পোশাক আর্দ্রতা শুষে নিত ও হাওয়া চলাচলের ফলে ঘাম তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যেত। আধুনিক ''বডি হাগিং'' পোশাকের ফলে ঘাম শুষে নেওয়া দূরে থাক ঘামে ভেজা পোশাক শরীরের ভাঁজেভাঁজে অনেকক্ষণ লেপটে থাকার ফলে, একটা পরিষ্কার জায়গাতেও অনেকদিন টানা জল জমলে যেমন শ্যাওলা জমে, ঠিক সেইরকম ছত্রাক সংক্রমণ হয়।

চালু পোশাকের ফলে দাদ বাড়ছে

মহিলা পুরুষ উভয়েরই কর্মস্থলের পোশাক এখন প্যান্ট—তাতে চলাফেরায় অবশ্যই কিছু সুবিধা হয়। কিন্তু নীচে অন্তর্বাস হিসাবে জাঙ্গিয়া অথবা প্যান্টি

প্রাচীন ভারতে কুষ্ঠরোগ, কর্কটরোগের বহু উল্লেখ আছে, কিন্তু ছত্রাকজনিত রোগ যেমন দাদ গোষ্ঠীভুক্ত কোনো রোগের উল্লেখ নেই।

দীর্ঘসময় পরে থাকার ফলে দীর্ঘমেয়াদি 'কুঁচকিতে দাদ' এক আধুনিক ব্যাধি যা সংকোচে মানুষ একে অন্যকে বলতে পারে না, কষ্ট পায়, ডাক্তার না দেখিয়ে বিজ্ঞাপনের স্টেরয়েড যুক্ত মলম লাগায় যার ফলে রোগ একটু থিতিয়ে গিয়ে আরও মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পরে। অনিয়মিত ভুল ওষুধের ফলে এই 'ডার্মাটোফাইট' জনিত ছত্রাক সংক্রমণ সারা ভারতে এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে আগের সব ছত্রাকনাশক ওষুধও এই ছত্রাকদের মারতে পারছে না, অর্থাৎ প্রায় সব ওষুধেই এরা 'রেজিস্ট্যান্ট' (Resistant) বা প্রতিরোধী হয়ে গেছে। কিছু অতিরিক্ত শক্তিশালী ছত্রাকনাশক ওষুধই একমাত্র কাজ করছে, যে ওষুধগুলো আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে লিভারের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। ষাট-সত্তরের দশকে মহিলা পুরুষ উভয়েই নিম্নাঙ্গে অন্তর্বাস হিসাবে উরু পর্যন্ত একটু নেমে আসা ঢিলা পাতলা সুতির কাপড়ের প্যান্ট পরতেন—যার ডিজাইনে জঙ্ঘাসন্ধি (Inguinal region) হাওয়া চলাচলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল। সে সময়ে ট্রেনের ঢোল কোম্পানির মলম ছাড়া আর কোনো ছত্রাকনাশকও হাতে ছিল না, তবু দাদ এত সমস্যার কারণ হয়ে ওঠেনি। তার পেছনে একটা বড়ো কারণ ছিল আবহাওয়ার উপযুক্ত পোশাক নির্বাচন। এখনও লেখকের ব্যক্তিগত সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রত্যন্ত গ্রাম ও আদিবাসী সমাজে মহিলা পুরুষদের কুঁচকিতে দাদের সংক্রমণ উচ্চবিত্ত শ্রেণি অপেক্ষা অনেক কম, কারণ কারণ তাঁরা জাঙ্গিয়া ব্য প্যান্টি ব্যবহার করেন না।

ফ্যাশন ডিজাইনার ও পোশাক নির্মাতা সংস্থারা ব্যাপারটা ভেবে দেখবেন কি যে—আবহাওয়া অনুযায়ী পোশাক তৈরি করতে হয়, শুধু বাণিজ্যের কথা ভেবে নয়। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. শর্মিষ্ঠা দাস, এমবিবিএস, ডিভিডি, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।.

Advt.

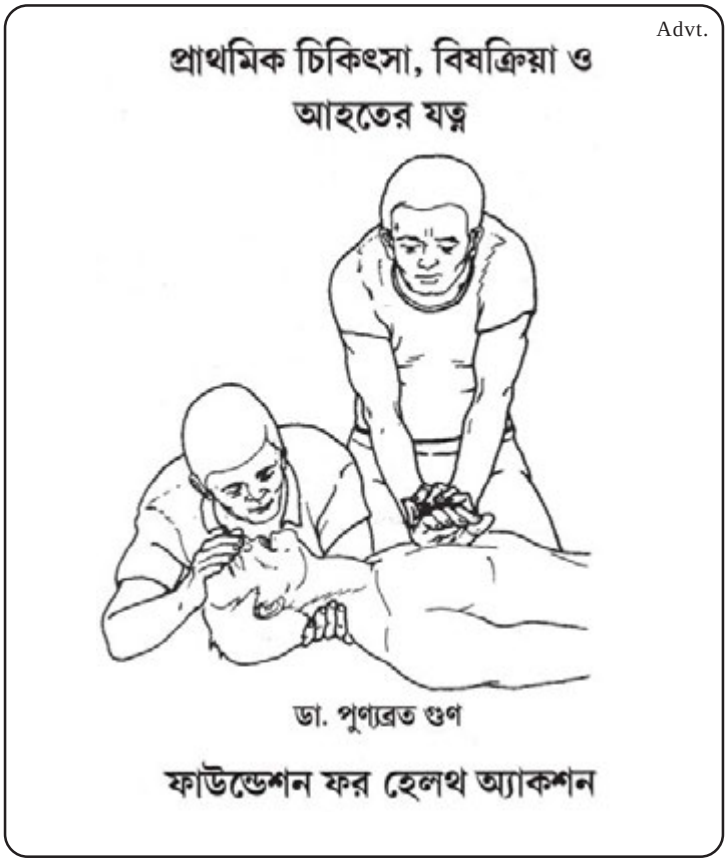

বই পড়া

সাপ নিয়ে ভুল ভাঙা, সাপের কামড় খেয়ে বেঁচে থাকা

সাপ, কামড় ও চিকিৎসা, প্রকাশক-যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং। ২১১ পাতার ঝকঝকে ম্যাপলিথো কাগজে ছবি, ম্যাপ, চার্ট প্রভতি সহযোগে হাজারো তথ্য সম্বলিত এক ক্ষেত্রসমীক্ষা ও বিশেষজ্ঞদের অমূল্য লেখা। ৫০০ টাকার এই বইটি পড়ার অভিজ্ঞতা *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র পাঠকদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন **অলকেশ মণ্ডল**।

অধিকাংশ মানুষ সাপ দেখলেই আগে মেরে ফেলার কথা ভাবেন। এইভাবে কত শত সাপ রোজ মানুষের হাতে মারা পড়ছে তার কোনো হিসাব নেই। সাপের কামড়ে মানুষ মারা যায় বলেই কি এই শত্রুতা? সাপ কি কেবল শত্রু? সাপের কামড়ে মানুষের যে মৃত্যু ঘটে তার জন্য কি সাপ দায়ী? মনে হয় সাপ সম্পর্কে অজ্ঞানতাই এই শত্রুতার উৎস। কারণ এই সাপই কখনো মশার লার্ভা খেয়ে, কখনো ইঁদুর খেয়ে আবার কখনো অন্য বিষধর সাপকে খেয়ে নীরবে যে আমাদের উপকার করে চলেছে তা আমরা ভেবেও দেখি না। অন্যদিকে পাঁচ বছর আগেই এক বিশেষজ্ঞ দল জানিয়েছিলেন যে সারা

আপনার আশেপাশে যত বেশি সাপ তত বেশি আপনার সুরক্ষা তথা লাভ

ভারতে বছরে মোট ৪৫৯০০ জনের মৃত্যু হয় শুধুমাত্র সাপের কামড়ে। সারা বিশ্বে সাপের কামড়ে যত মানুষ মারা যায় তার প্রায় অর্ধেক এই সংখ্যা। এই মৃতের তালিকার অধিকাংশই গ্রামের শ্রমজীবী মানুষ। যাঁরা আবার শস্য বা মাছের উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। এদের পরিশ্রমের ফসলই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। অথচ এঁদের বিপদ-আপদে আমাদের মাথাব্যথা থাকে না। কিন্তু সমাজের সবাই উদাসীন নন। আর সেই কারণেই বিগত ত্রিশ বছর ধরে মূলত শ্রমজীবী মানুষের বিপদে বন্ধুর মতো পাশে দাঁড়িয়েছেন যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং। যেখানেই সাপের কামড়ে মানুষ বিপদের মুখোমুখি হয়েছে বা হবার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানেই হাজির ওঁরা। সাপে কাটা রোগীকে অন্ধ বিশ্বাসের কানাগলি থেকে বের করে হাসপাতালমুখী করে তোলার প্রয়াসে তাঁরা সফল। সেই সফলতার নজির হিসাবে নতুন

ধানজমিতে সাপ না থাকলে ইঁদুরের উৎপাত বাড়ে। বিঘাপ্রতি ১৮০ কেজি ধান নষ্ট করার ক্ষমতা রাখে এই ছোট্ট প্রাণীটি।

এক প্রকাশনা নিয়ে এল এই সংস্থা। *সাপ, কামড় ও চিকিৎসা* নামে দুশো-এগারো পাতার ঝকঝকে ম্যাপলিথো কাগজে ছবি, ম্যাপ, চার্ট প্রভৃতি সহযোগে হাজারো তথ্য সম্বলিত এক ক্ষেত্রসমীক্ষা। সমীক্ষার পরিধি পশ্চিমবঙ্গের একটি মাত্র জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা হলেও আরও তিনটি জেলার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে সাপে কাটা সমস্যা হল ভারতের সবচেয়ে উপেক্ষিত জনস্বাস্থ্য সমস্যা। এই বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে এমনকী সরকারি আধিকারিকগণও তা স্বীকার করেছেন। তাই আর উপেক্ষা নয়। মৃত্যুর মিছিল রোধে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সাপ সম্পর্কে জানা ও বোঝার পরিধি যত বাড়বে সাপের কামড়ে মৃত্যুর সংখ্যাও তত কমবে। আর তার জন্য উপযুক্ত হাতিয়ার হয়ে উঠুক এই বইটি।

বইটিতে প্রকাশক সংস্থার সম্পাদকের দীর্ঘ আলোচনায় সংস্থার নানান কার্যকলাপ বিবৃত হয়েছে। সম্পাদক মহাশয় সাপকে বা সাপের জগৎটাকে নানাভাবে চিনিয়ে দিয়েছেন। বিষধর ও নির্বিষ সাপের চেহারা, খাদ্যাভ্যাস, বাসস্থান, চালচলন, উপকারিতা প্রভতি নানা আলোচনায় সমৃদ্ধ তাঁর লেখা। কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার, নির্বিচারে বৃক্ষছেদন অথবা সাপকে মেরে কীভাবে আমরা নিজেদের বিপদ ডেকে এনেছি তার যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ রয়েছে। দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

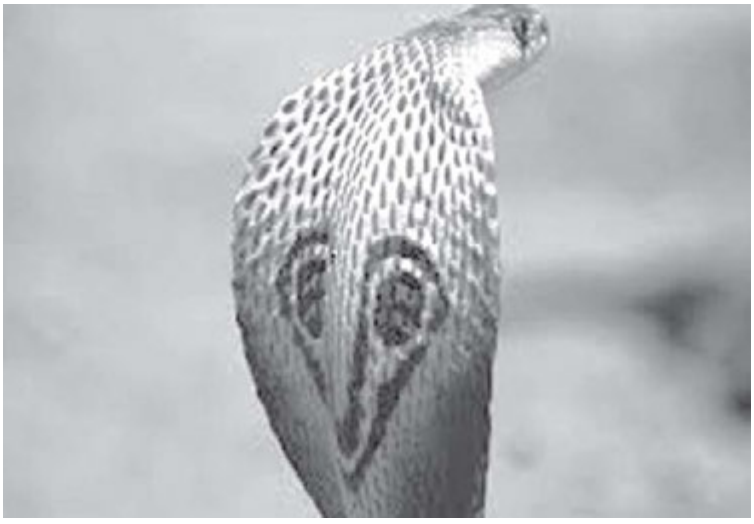

বিষধর শাঁখামুটি সাপের প্রধান খাদ্য অন্য সাপ। সুন্দরবন অঞ্চলে নিরীহ শাঁখামুটিকে মেরে নিশ্চিহ্ন করার ফলে এই অঞ্চলে কালাজের কামড়ের ঘটনা বেড়ে গেছে। এর ফলে সাপের কামড়ে মৃত্যুর হারও ক্রমবর্ধমান। অন্যদিকে বিষধর শাঁখামুটি সাপ আছে বলে উত্তরবঙ্গে কালাজের বাড়বাড়ন্ত নেই।

ধানজমিতে সাপ না থাকলে ইঁদুরের উৎপাত বাড়ে। বিঘাপ্রতি ১৮০ কেজি ধান নষ্ট করার ক্ষমতা রাখে এই ছোট্ট প্রাণীটি। আবার একজোড়া ইঁদুর চক্রবৃদ্ধিহারে এক বছরে ৮৮৮ টি ইঁদুরের জন্ম দিতে পারে।

তাই নতুন করে ভাববার প্রয়োজন পড়ে। সেক্ষেত্রে সম্পাদক মহাশয়ের পরামর্শ এই যে ''আপনার আশেপাশে যত বেশি সাপ তত বেশি আপনার সুরক্ষা তথা লাভ''। এছাড়াও এই লেখায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সাতাশটা ব্লকের ৩৬৪৪টা গ্রামসংসদের ১৯ লক্ষ জনসংখ্যার জীবনযাত্রার মান, স্বাস্থ্যপরিষেবার চিত্র থেকে শুরু করে সাপের অবস্থান, সাপে কাটা,

এখনও যাঁরা হোমিয়োপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক বা গাছগাছড়ার চিকিৎসার গুণগান করেন তাঁরা অন্তত ওই সব পদ্ধতিতে সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসার অসারতা সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন।

চিকিৎসা, মৃত্যু প্রভৃতি নানা পরিসংখ্যানে পরিপূর্ণ, যা ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১২ সালের মার্চ পর্যন্ত সংস্থার স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা ক্ষেত্রসমীক্ষার ফল।

ডা. নির্মলেন্দু নাথের লেখাও পুরোপুরি তথ্যভিত্তিক। ওই একই ক্ষেত্রসমীক্ষার অন্য নির্যাস। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সঙ্গে বর্ধমান, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার নানান তথ্যে ঠাসা। জেলা, মহকুমা, ব্লক হয়ে গ্রামস্তরে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল, সরকারি দপ্তরগুলোর পরিসংখ্যানের তারতম্য ছাড়াও সাপের কামড় থেকে চিকিৎসা এবং মৃত্যুর নানাবিধ পরিসংখ্যানে পরিপূর্ণ।

'সাপের কামড় ও তার প্রতিকার' নামে দু-টি প্রবন্ধ লিখেছেন দুই জন ডাক্তার। চিকিৎসক, নার্স অথবা স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে যাঁরা গ্রামে যান, কিংবা যেতে হয় বা হবে তাঁদের জন্য অপরিহার্য এই অভিজ্ঞতার ঝুলি।

ডা. সমরেন্দ্রনাথ রায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় কাজ করার সুবাদে তাঁর ২৫-২৬ বছরের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। হাসপাতালে আসা এগারো জন রোগীর সর্পদংশনের ইতিহাস এবং তারপর সময়ানুযায়ী তার উপসর্গ ও চিকিৎসা কীভাবে হয়েছে তা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। এর সঙ্গে তিনি 'সাপে কাটা'-র বিভিন্ন উপসর্গ ও লক্ষণ, চিকিৎসার ফল, সমস্ত পর্যবেক্ষণ করে তার নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে এমনভাবে চিহ্নিত করেছেন যে ডাক্তারদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসার নানা অজানা এবং আশ্চর্য দিক-গুলোকে জানতে পারবেন। ফলে সাপের কামড়ে মৃত্যুর হার তো কমবেই, অকারণ বড়ো হাসপাতালে রেফারের দরুন অর্থদণ্ড কিংবা অযাচিত রোগী-মৃত্যুর কারণে হাসপাতাল ভাঙচুরের মতো অপ্রীতিকর ঘটনাও এড়ানো সম্ভব।

ডা. বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ সহজ ও সরলভাবে জীবন বিজ্ঞানের ছাত্রের মতো বুঝতে সাহায্য করে যে সাপের বিষ কীভাবে ও কেন আমাদের শরীরে কী কী উপসর্গ সৃষ্টি করে ও ক্ষতি করে। ফলে আমাদের দেশে এখনও যাঁরা হোমিয়োপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক বা গাছগাছড়ার চিকিৎসার গুণগান করেন তাঁরা অন্তত ওই সব পদ্ধতিতে সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসার অসারতা সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন। আবার তাঁর আক্ষেপ এই যে দেশের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বসহকারে সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসার বিষয়টি শেখানো হয় না। এমনকী চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ্যপুস্তকগুলিও বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। উদাহরণ হিসাবে তিনি দেখিয়েছেন যে পেট ব্যথা, বমি ভাব কিংবা বার বার মলত্যাগের ইচ্ছা নিয়ে কেউ হাসপাতালে ভর্তি হলে তা ডায়রিয়া না হয়ে সাপের কামড়ের উপসর্গও হতে পারে। তাই চিকিৎসকের কতটা নিবিড় পর্যবেক্ষণের ওপর রোগীর বাঁচা-মরা নির্ভর করছে তা জেনে আশ্চর্য হতে হয়। আবার ইঁদুরদৌড়ের খেলায় বিপুল খরচের বিনিময়ে চিকিৎসক হতে গিয়ে রঙিন জীবনের স্বপ্নে মশগুল এক তরুণের কি সত্যিই এই রকমের পরোপকারী হবার দায় থাকে? সকলের না থাক, কিছু মানুষের তো থাকে। এই বই সে কথারই প্রমাণ দেয়।

প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধে এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক সাপ 'কালাজ' -এর উল্লেখ বার বার করা হয়েছে। হয়তো এর ভয়ানক দিকটাকে বোঝানোর প্রয়োজনে। যে সাপ বিছানায় থাকতে পছন্দ করে। যার কামড়ে জ্বালাযন্ত্রণা হয় না। যার মাত্র এক মিলিগ্রাম বিষ সুস্থ মানুষকে কয়েক ঘণ্টায় মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারে। তাকে নিয়ে তো মাথাব্যথা হবেই। বিশেষত সুন্দরবন অঞ্চলে কালাজের কামড়ের ঘটনা এবং মৃত্যুর রিপোর্ট বেশি।

বইটি অনেক প্রশ্নও তুলে দিতে সাহায্য করেছে। জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (NRHM)-এর অর্থানুকূল্যে সরকার কেবল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মানুষের জন্য সমীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন কেন? পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কি রাজ্যের বাকি জেলা-গুলোতেও এই সমীক্ষা চালাতে পারতেন না? তাহলে তো সাপ সংক্রান্ত রাজ্যভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ তথ্য আজ আমাদের হাতে আসত? তবুও দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো বইতে উল্লেখিত একটা জেলার সমীক্ষা রাজ্যের বাকি অংশের মানুষের হালচাল বুঝতে কিছুটা হলেও সাহায্য করবে। যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং-এর ব্যাপক প্রচারের ফলে সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষ না হয় হাসপাতালে গেল, বাকি মানুষদের কে সচেতন করবে? হাসপাতালে রোগীর যথাযথ চিকিৎসার দায় কার? কবে রাজ্যের সমস্ত সাপে কাটা রোগীকে হাসপাতালমুখী করা যাবে? সরকারি দপ্তরগুলোর দায়বদ্ধতা মানুষ কবে অনুভব করার সুযোগ পাবে?

আশা এই যে সাধারণ মানুষ সাপের জগৎ নিয়ে অনেক প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পাবেন এই বই পড়ার সুবাদে। কিন্তু পাঁচশো টাকা দামের এই বই ক-জন মানুষ পড়ার সুযোগ পাবে সে বিষয়ে ধন্দ থেকে যায়। সমাজের ব্যাপক মানুষের কাছে এই বার্তা না পৌঁছালে এই অসাধারণ প্রচেষ্টার পুরো লাভ পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে যে গরিব মানুষরা সাপ নিয়ে ঘর করেন, তাঁদের কাছে কথা- গুলো যাওয়া দরকার। পাঠকরা তাই বিকল্প হিসাবে নিজের এলাকার লাইব্রেরিতে যাতে বইটি থাকে তার জন্য উদ্যোগ নেবেন, এমন ভরসায় থাকলাম। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

লেখক বিজ্ঞানকর্মী।

Advt.

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

একুশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র

৩১, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরানগর, কলকাতা - ৭০০ ০৩৬

যোগাযোগ ঃ ৯৮৩৬৪৭৭১৯৫, ৯৮৩০৬৭৩৫১২

এছাড়া কমবয়সীদের জন্য আছে আকর্ষণীয় গল্প-ফিচার-ছবিতে ঠাসা কিশোর যুক্তিবাদী

খবর

ফাইজার কোম্পানিকে নিউমোনিয়া টিকার পেটেন্ট দেবার বিরোধিতায়

‘ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস’

ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস, ফরাসি ভাষায় লিখলে মেদিসিনস স্যান্স ফ্রন্তিয়ারস, সংক্ষেপে এমএসএফ (MSF)। নামেই প্রকাশ আন্তর্জাতিক চিকিৎসকদের সংগঠন এটি। ভারতের আদালতে এমএসএফ একটি ‘পেটেন্ট বিরুদ্ধতা’ কেস করেছে। আমেরিকার ওষুধ কোম্পানি ফাইজার যাতে নিউমোনিয়ার প্রতিষেধক একটি বিশেষ টিকা-কে নিজের পেটেন্ট অধিকারে না আনতে পারে, সেটাই এমএসএফ-এর উদ্দেশ্য। এই ভ্যাক্সিন বা টিকার টেকনিক্যাল নাম হল নিউমোকক্কাল কনজুগেট ভ্যাকসিন (সংক্ষেপে পিসিভি ১৩)। ভারতে এই প্রথম কোনো টিকার পেটেন্ট কোনো ডাক্তারি সংগঠনের দ্বারা আইনি পথে বাধা পেল, আর এ-প্রচেষ্টা সফল হলে এই জীবনদায়ী টিকা কম দামে প্রস্তুত করে উন্নয়শীল দেশগুলিতে ও নানা মানবিক ও ত্রাণসংস্থার কাজে লাগানো যাবে।

একই ধরনের পেটেন্ট আবেদন ইউরোপীয়ান পেটেন্ট অফিস খারিজ করে দিয়েছে, ও দক্ষিণ কোরিয়ায় তা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

ফাইজার কোম্পানির সঙ্গে দরাদরি করে বছরের পর বছর ধরে টিকার দাম কমানোর নিষ্ফলা প্রচেষ্টা চালানোর পর এমএসএফ ভারতের কোর্টে ফাইজারের ভারতে পেটেন্ট নেবার আবেদনকেই বাধা দেবে। পেটেন্ট পাবার আগেই তাকে বাধা দেওয়া—একে বলা যেতে পারে পেটেন্ট আবেদনের এক ‘নাগরিক বিচার’। এতে বিচারকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে, কেন ভারতের পেটেন্ট আইন অনুসারে এই টিকার পেটেন্ট-আবেদনের কোনো কোনো অংশ গ্রাহ্য হবার যোগ্য নয়। ফাইজার কোম্পানি বলছে, তাদের জিনিসটি পেটেন্ট পাবার যোগ্য, কেননা স্ট্রেপ্টোকক্কাস জীবাণুর ১৩টি ধরন (সেরোটাইপ) একটিমাত্র টিকার মাধ্যমে দেবার ব্যাপারটা নতুন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, একই ধরনের পেটেন্ট আবেদন ইউরোপীয়ান পেটেন্ট অফিস খারিজ করে দিয়েছে, ও দক্ষিণ কোরিয়ায় তা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এমএসএফ চায়, ফাইজারের হাতে পেটেন্টের একচেটিয়া অধিকার যেন না থাকে, তাতে অন্য কোম্পানিগুলো একই কাজ করে এমন টিকা কম পয়সায় তৈরি করতে পারে।

এমএসএফ-এর দক্ষিণ এশিয়ার ‘অ্যাকসেস ক্যাম্পেন’-এর প্রধান লীনা মেঙ্ঘানে বলেছেন, ‘পেটেন্ট পাবার আগেই তাকে বাধা দেওয়া—আমাদের এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হল এটা দেখানো যে, ফাইজার সামান্য কারিকুরি কোনো জিনিসকে ‘নতুন’ বলে পেটেন্ট নিতে চাইছে, এটা ভারতীয় আইনের বিরুদ্ধে, আর ফাইজারের আসল উদ্দেশ্য হল যেকোনো উপায়ে একচেটিয়া বাজার তৈরি করা। ফাইজারের পেছনে ওষুধ-লবি আছে, ও তার মদতদাতা আমেরিকা সরকারের কূটনৈতিক চাপও আছে, তবুও ভারতের উচিত একে বাধা দেওয়া। কেননা ভারত নিজের জন্য (ওষুধের) পেটেন্ট দেবার যে মাপকাঠি ঠিক করেছে, চাপে পড়ে সেটাকে বদলানো ঠিক নয়। ভারতে কেবল ‘জেনেরিক কম্পিটিশন’-কে আটকানোর মতো পেটেন্ট দেবার আইন রয়েছে, আর ফাইজারের এই টিকাটি সেই যোগ্যতামান অর্জন করেনি। একে পেটেন্ট না দিয়ে, একই কাজে করে এমন টিকা যাতে অন্যরা কম দামে তৈরি করে বাজারে ছাড়ে, সেটার পথ খুলে রাখা উচিত।’

পাঁচ বছরের নীচে বাচ্চাদের মৃত্যুর একটা বড়ো কারণ হল নিউমোনিয়া; প্রতি বছর দশ লক্ষ বাচ্চা এতে মারা যায়। কেবল ফাইজার আর গ্ল্যাক্সোস্মিথক্লাইন (জিএসকে, GSK)-এর টিকা তৈরি করে। সেগুলো পুরোমাত্রায় ব্যবহার করতে পারলে এই বিপুল মৃত্যুর অনেকটাই ঠেকানো যায়। ফাইজার-এর তৈরি নিউমোকক্কাল কনজুগেট ভ্যাক্সিন (পিসিভি ১৩)-এর নাম হল ‘প্রেভনার’, কিন্তু সেটা উন্নয়নশীল দেশ ও সেবাসংস্থা-গুলোর কাছে বড্ড বেশি দামি। ২০১৫ সালের এক এমএসএফ রিপোর্ট, ‘‘The Right Shot: Bringing down Barriers to Affordable and Adapted Vaccines’’ জানাচ্ছে, ২০০১ সালে শিশুর টিকাকরণে যে খরচ হত, এখন তার ৬৮ গুণ বেশি খরচ হচ্ছে। দরিদ্রতম দেশগুলোর ক্ষেত্রে, পুরো টিকাকরণের খরচের অর্ধেকই নিউমোনিয়ার টিকার পিছনে ব্যয় হয়।

এমএসএফ-এর অ্যাকসেস ক্যাম্পেন-এর এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ডা. মনিকা বালাশেগরম বলেছেন, ‘নিউমোনিয়ার টিকা হল বিশ্বের সবথেকে

পাঁচ বছরের নীচে বাচ্চাদের মৃত্যুর একটা বড়ো কারণ হল নিউমোনিয়া; প্রতি বছর দশ লক্ষ বাচ্চা এতে মারা যায়।

বেশি বিক্রির টিকা, আর গত বছর ফাইজার এই একটা জিনিসই ৬ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিক্রি করেছে। অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে লক্ষ কোটি বাচ্চার এই অসুখের ঝুঁকি রয়েছে, তারা এই টিকার সুবিধা পাচ্ছে না। সমস্ত শিশু যাতে এই টিকা নিয়ে মারণ নিউমোনিয়া থেকে মুক্তি পায় সেটা নিশ্চিত করতে হলে, অন্য কোম্পানিগুলোও যাতে এই টিকা তৈরি করে ফাইজারের থেকে অনেক কম দামেই বাজারে ছাড়ে সেটা দেখতে হবে।’

ইতোমধ্যেই ভারতের একটি টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থা জানিয়েছে যে তারা টিকার তিনটে ডোজ দেবার জন্য ৬ ডলার দাম নেবে। এটা বিশ্বের বর্তমান চালু দাম ১০ ডলারের থেকে অনেকটাই কম। কিছু উন্নয়নশীল

২০০১ সালে শিশুর টিকাকরণে যে খরচ হত, এখন তার ৬৮ গুণ বেশি খরচ হচ্ছে।

দেশে দাতা-দ্বারা ফান্ডিং (Gavi নামক 'ভ্যাক্সিন অ্যালায়েন্স'-এর প্রকল্পের মাধ্যমে) এর সাহায্যে এই টিকাকরণ সম্ভব হয়েছে।

২০১৫ সালে ওয়ার্ল্ড হেলথ অ্যাসেম্বলি-র ১৯৩টি দেশের প্রত্যেকে একমত হয়ে একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সাধ্যের মধ্যে দামে টিকার ব্যবস্থা করতে হবে, এবং টিকার মূল্য নির্ধারণে স্বচ্ছতা থাকতে হবে। গত বছর ৫০-এর বেশি দেশ টিকার অতিরিক্ত দাম ও নতুন টিকা চালু করার সমস্যা নিয়ে সরব হয়; ইন্দোনেশিয়া, জর্ডন ও তিউনিশিয়া এদের অন্যতম।

ডা. বালাশেগরম বলেছেন, ''প্রতি ৩৫ সেকেন্ডে একটি শিশু নিউমোনিয়ায় মারা যায়। ডাক্তার হিসেবে আমাদের বড়ো বেশি নিউমোনিয়ায় মৃত্যু দেখতে হয়, তাই যতদিন না প্রতিটি দেশ তার শিশুদের এ-রোগের টিকা দিতে পারছে ততদিন আমরা থামব না। কবে প্রত্যেক দেশ তার সমস্ত শিশুর জন্য এই টিকা কিনে দিতে সক্ষম হবে, ততদিন আমরা অপেক্ষা করতে পারি না।"

প্রতি বছর এমএসএফ-র কিছু দল কয়েক মিলিয়ন মানুষকে টিকা দেয়। সেটা হাম, মেনিঞ্জাইটিস, পীত জ্বর, কলেরা ইত্যাদি রোগের ছড়িয়ে পড়া আটকাতে হতে পারে, আবার রুটিনমাফিক টিকাকরণের অঙ্গও হতে পারে—দ্বিতীয়টা হয় যখন এমএসএফ মা ও শিশুকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবার কাজটি করে। কেবল ২০১৪ সালেই এমএসএফ ৩৯ লক্ষ ডোজ টিকা ও ওই জাতীয় ওষুধ দিয়েছে। এমএসএফ নিউমোনিয়া আটকাতে নিউমোকক্কাল কনজুগেট ভ্যাক্সিন (পিসিভি) এতাবৎ কিনেছে কেবল রোগের ছড়িয়ে পড়া আটকাতে জরুরি ব্যবস্থা হিসেবে। আরও বেশি করে রুটিন

২০০১ সালে শিশুর টিকাকরণে যে খরচ হত, এখন তার ৬৮ গুণ বেশি খরচ হচ্ছে।

টিকাকরণ করতে চাইছে এমএসএফ, আর জরুরি অবস্থায় আরও বেশি মানুষের কাছে টিকা পৌঁছেও দিতে চাইছে। তাই পিসিভি ও অন্যান্য টিকা আরও বেশি চাইছে তারা। সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, ইথিয়োপিয়া, দক্ষিণ সুদান, উগান্ডা ও আরও নানা জায়গায় যে সব শিশু বিপদে পড়েছে, তাদের টিকাকরণের কাজটা এমএসএফ-ই করেছে।

২০১৫ সালে এমএসএফ 'এ ফেয়ার শট' ক্যাম্পেন শুরু করেছে, তার একটা উদ্দেশ্য হল ফাইজার ও জিএসকে যাতে নিউমোকক্কাস টিকার দাম কমিয়ে (তিন ডোজের জন্য ৫ ডলার) দেয়। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেটে http://www.doctorswithoutborders.org/article/msf-challenges-pfizer%E2%80%99s-attempt-patent-pneumonia-vaccine-india ১১ মার্চ ২০১৬ প্রকাশিত।

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান :

দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১।

যোগাযোগ : ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

ফোন- ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

দ্য টেলিগ্রাফ ক্যালকাটা সান ডে, ২৪ নভেম্বর ২০১৩

ছবিকরকম

মায়ের দুধের পরেও কোনো ‘ফর্মূলা দুধ’ নয়

২০১৬ সালের মে মাসে *ল্যান্সেট* পত্রিকা জোরগলায় জানাচ্ছে, মায়ের দুধের বদলে, এবং তারপরেও কৃত্রিম ফর্মূলা’ দুধ নয়।

মাতৃদুগ্ধের বিকল্প খাদ্য’-এর বাজার নিয়ন্ত্রণ মায়ের দুধ খাওয়ানোর বিশ্বজোড়া বড়ো স্তম্ভ। ১৯৮১ সালে আন্তর্জাতিক ‘মাতৃদুগ্ধের বিকল্প’ বাজারজাত করার নিয়ম তৈরি হয়। ‘শিশুখাদ্য’ বা ‘শিশু ফর্মূলা’ যেভাবে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে ও বাজারে চালানো হচ্ছে সেটা নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল; বিশেষ করে ‘ফর্মূলা দুধ’ তৈরি করার জন্য উপযুক্ত জীবাণুমুক্ত জল আর বীজাণুশূন্য (স্টেরিলাইজ) করার উপায় যেসব জায়গায় মায়েদের হাতের নাগালে নেই, সেখানে এই উদ্বেগের কারণ আরও বেশি ছিল। ‘মাতৃদুগ্ধের বিকল্প’-কে

> ‘মাতৃদুগ্ধের বিকল্প’-কে নিয়ন্ত্রণ করার এই নিয়মাবলি মায়েদের কাছে সরাসরি ‘ফর্মূলা দুধ’ বিজ্ঞাপন করা নিষিদ্ধ করে।

নিয়ন্ত্রণ করার এই নিয়মাবলি মায়েদের কাছে সরাসরি ‘ফর্মূলা দুধ’ বিজ্ঞাপন করা নিষিদ্ধ করে। ‘ফর্মূলা দুধ’ স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো এমন প্রচার, বা স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে ‘ফর্মূলা দুধ’ স্যাম্পল দেওয়া বা অন্য কোনোভাবে উপঢৌকন দেওয়া নিষিদ্ধ হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ ও ইন্টারন্যাশনাল বেবি ফুড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক—এদের মিলিত প্রচেষ্টায় একটি নতুন রিপোর্ট সম্প্রতি বেরিয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০১১ সাল পর্যন্ত ১৯৪ দেশের মধ্যে ১০৩টি দেশ এই ‘ফর্মূলা দুধ’ নিয়ন্ত্রণ নিয়মাবলি অনুসারে কিছু-না-কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল, আর এখন ১৩৫টি দেশ তেমন পদক্ষেপ নিয়েছে—এটা একটা আশার কথা। সমস্যা হল, মাত্র ৩৯টি দেশ নিয়ন্ত্রণ নিয়মাবলির পুরোটা কার্যকর করার মতো আইন করেছে।

আশ্চর্য ব্যাপার হল যে উন্নত দেশগুলোর অনেকেই, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, এবং পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশ, সবচেয়ে কম আইনি ব্যবস্থা নিয়েছে। আবার চীনের মতো মধ্যবর্তী অর্থনৈতিক অবস্থার দেশও সেরকমই কম ব্যবস্থা নিয়েছে। এসব দেশের অনেকগুলোতেই মাতৃদুগ্ধ খাওয়ানোর হার কম, বিশেষ করে শিশুর ছ-মাস বয়সের পরে। অন্যদিকে, কিছু দরিদ্র দেশে আইন আছে বটে, কিন্তু সেগুলো সর্বজনীনভাবে লাগু করা, সর্বমান্য করিয়ে তোলা, ও আইন মানা-না-মানা দেখভাল করে তথ্য জোগাড় করা—এসবের উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই।

ল্যান্সেট পত্রিকার ওই সংখ্যায় প্রকাশিত অনেক লেখাতেই কেবলমাত্র মাতৃদুগ্ধ পানের উপকারিতা খুব স্পষ্ট করে প্রমাণ করা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বের অধিকাংশ শিশু আজও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা অনুসারে মায়ের দুধ খায় না, আর অনেক বাচ্চাই কোনো-না-কোনো ‘ফর্মূলা দুধ’ খেয়ে থাকে। আগের বলা রিপোর্টে দেখা গেছে অনেক দেশেই ‘ফর্মূলা দুধ’ প্রস্তুতকারকদের পক্ষে প্যাকেটের ওপর ‘ফর্মূলা দুধ’-টি নিরাপদভাবে প্রস্তুত করার পদ্ধতি লেখা নেই, এবং আশ্চর্যের বিষয় হল, এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সেসব দেশে যথাযথ আইন নেই।

ল্যান্সেট-এর সম্পাদকীয়তে উপসংহারে বলা হয়েছে, তামাক, চিনি, ইত্যাদির মতো যেখানে বাণিজ্যিক স্বার্থ গণস্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে যায় সেখানে সবচেয়ে দুর্বল মানুষজনের ওপরই আঘাত সবচেয়ে কঠিন হয়, আর ‘ফর্মূলা দুধ’-এর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তিনবছর পর্যন্ত বাচ্চাদের যেকোনো দুগ্ধজাত দ্রব্য খাওয়ানোর চেষ্টা করে এমন সবরকম বিজ্ঞাপনের ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ জারি করা, আর সোশ্যাল মিডিয়ায় নানাভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টার ওপর এবার নিষেধাজ্ঞা টানা দরকার।

> যেখানে বাণিজ্যিক স্বার্থ গণস্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে যায় সেখানে সবচেয়ে দুর্বল মানুষজনের ওপরই আঘাত সবচেয়ে কঠিন হয়, আর ‘ফর্মূলা দুধ’-এর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

আমাদের প্রশ্ন হল, আমাদের দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী থেকে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এর গুরুত্ব বুঝছেন কি? স্বাস্থ্যের বৃত্তে

তথ্যসূত্র: *The Lancet*, Editorial, Volume 387, No.10033, p.2064, 21 May 2016। ইন্টারনেটে লেখাটি লভ্য (http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30599-2/fulltext?rss=yes)।

শব্দ-ছক

প্রস্তুতি: রুচিরা মজুমদার

✠	✠	✠	১	✠	✠	২	৩	✠	৪	৫
✠	৬			৭	✠	✠	৮			
৯		✠	১০			✠	✠	✠		✠
✠		✠	✠	✠	✠	১১		১২		✠
১৩		১৪			✠		✠		✠	১৫
	✠	১৬		✠	১৭		✠	✠	১৮	
	✠		✠	১৯	✠	২০				✠
✠	২১		২২		✠		✠	✠	২৩	২৪
✠	✠	✠	২৫		২৬		✠	২৭		
✠	২৮			✠		✠	২৯		✠	
৩০		✠	৩১		✠	৩২		✠	৩৩	

সমাধান ১৫ পাতায়

সূত্র: পাশাপাশি: ১. এটা থেকে সানস্ট্রোক হতে পারে। ২. এই চা বেশি উপকারী। ৪. টাইটিস যোগ করলে লিভারের মারাত্মক অবস্থা। ৬. প্রথম বাঙালি মহিলা ডাক্তার। ৮. হজম, ৯. কানেও লাগতে পারে। ১০. বোতলের এটা থেকে সংক্রমণ হতে পারে। ১১. এর অভাবে গলগণ্ড হয়। ১৩. রক্তের জমাট বাধার অসুখ। ১৬. সোয়েটার বুনতে লাগে। ১৭. আগে জ্বর হলে দুধ দিয়ে এটা খেতে হত। ১৮. গাছ লাগাতে লাগে। ২০. মেয়েদের হরমোন। ২১. হাড়ের মধ্যে ক্ষয়রোগ। ২৩. আকার বাদ দিলে ছোট্ট চুমুক। ২৫. করে কোনো লাভ নেই, ক্ষতি আছে। ২৭. হার্টে থাকে, আবার জলট্যাঙ্কের কাছেও থাকে। ২৮. চোখের অংশ, ২৯. এই রকম খাবার খান। ৩০. ডাক্তাররা এর হিস্ট্রি নিয়ে মাথা ঘামান। ৩১. ধুলোতে অ্যালার্জি থেকেও হতে পারে। ৩২. শিশুদের প্রাথমিক চলনভঙ্গি। ৩৩. এতে টেস্টবাড আছে।

সূত্র: উপরনীচ: ১. কলকাতার মানসিক স্বাস্থকেন্দ্র। ৩. এরকম দাড়ি রাখুন, ক্ষতি নেই, কিন্তু মনের মধ্যে নেবেন না। ৪. এই ওষুধ রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয়। ৫. রান্না। ৬ যে অসুখ সুকুমার রায়ের অকাল মৃত্যুর কারণ। ৭. কদমফুল। ১১. যন্ত্রণা কমায় এই ওষুধ। ১২. আগে স্লিপ বসলে বিপদ। ১৩. পাহাড়ে পাওয়া যায়—আবার গলব্লাডারেও। ১৪. ইউরিক অ্যাসিড তৈরি করে। ১৫. একটি খাদ্যশস্য। ১৮. ফুলে উঠলে ডাক্তারবাবুর কাছে যেতেই হয়। ১৯. সংক্রামক রোগীকে আলাদা রাখার জন্য দরকার। ২২. কেটে গেলে এই ইঞ্জেকশান দরকার। ২৪. মনোবিজ্ঞানে ইনি স্মরণীয়। ২৬. অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চিকিৎসা। ২৭. বেশি খাবেন না। ২৮. দৌড় প্রতিযোগিতা, ২৯. একটি ধাতু।

Advt.

সবার জন্য স্বাস্থ্য সম্ভব?

কেন্দ্র সরকার কমিটি বলছে

সম্ভব

সরকার বলছে

অসম্ভব

আমরা বলছি

সবার জন্য স্বাস্থ্য চাই

আপনি?

'সবার জন্য স্বাস্থ্য' প্রচার কমিটি